এত রক্ত কেন

সমরেশ মজুমদার

নবজাতক প্রকাশন
এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর ১৯৭১

প্রকাশক :
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক :
শ্রীহিমাদ্রী রায়
রামকৃষ্ণ প্রেস
৯এ রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

কৈলাসনগরে ভাল কলেজ থাকলেও তার খ্যাতি আগরতলার মহারাজের স্থাপিত কলেজের মতো নয়। স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় অজয় জেদ ধরেছিল সে আগরতলায় পড়তে যাবে। কলেজ এবং হোস্টেলের খরচ চালানো ওর বাবার পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু তিনি চাইছিলেন ছেলে চোখের সামনে থাকুক। মুশকিল হল ওর মামাকে নিয়ে। তিনি নির্দেশ পাঠালেন, 'ভাগ্নে যা চাইছে তাই করতে দেওয়া হোক!' সম্বন্ধীর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা শুধু হেমেন দেববর্মা কেন, ত্রিপুরার বেশির ভাগ উপজাতি মানুষের নেই।

তবে একটি ব্যাপারে হেমেন দেববর্মা নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর ছেলে অজয় মামার পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি। মামাকে সে শেষবার দেখেছে তার আট বছর বয়সে। তখন থেকেই মামা আন্ডারগ্রাউন্ডে, স্বাধীন ত্রিপুরা আন্দোলনের পুরোভাগে। দশ-বারো বছর বয়সে পৌঁছালেই অনেক উপজাতি কিশোর ওই স্বাধীন ত্রিপুরার জ্বরে আক্রান্ত হয়। পড়াশুনা চুলোয় যায়। বাড়ি ছাড়ে। বিছানায় শুয়ে রোগে ভুগে তাদের মৃত্যু হয় না। তারা মরে বি. এস. এফ অথবা আধা সামরিক বাহিনীর গুলিতে। সেটা যদি কপালে না লেখা থাকে তা হলে পালটা জঙ্গি সংগঠনের এ কে ফর্টিসেভেন তো উঁচিয়ে থাকেই। অজয় এই আবেগে ভাসেনি। মন দিয়ে পড়াশুনা করেছে। হেমেন দেববর্মা ছেলের কানে সুপরামর্শ ঢেলে দিয়েছেন সবসময়। হ্যাঁ, স্কুলে থাকতে ওকে কারও খপ্পরে পড়তে দেননি।

কলেজটি নামকরা। হোস্টেলের ব্যবস্থাও ভাল। দুপুরে অজয়কে তার ঘরে নিয়ে গেল দারোয়ান। তখনও রুমমেট আসেনি। একটু আগে সুপার তাকে হোস্টেলের নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, নিয়ম না ভাঙলে কাউকে তাড়ানো হয় না। আর হ্যাঁ, বড়দের মুখের ওপর প্রতিবাদ না করলে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। শিশুবেলা থেকে শোনা এইসব উপদেশ মান্য করতে তার কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

সারাদিন সে ঘরে একাই ছিল। বই নিয়ে সময় কাটাচ্ছিল। সন্ধের পর দরজায় শব্দ হল। সে উঠে দরজা খুলতেই চারজন ছেলে ভেতরে ঢুকল। ওরা তার চেয়ে বয়সে বড়। বোঝা যাচ্ছে, এই হোস্টেলেই থাকে। একজন দরজাটা বন্ধ করে দিল। ওরা বসল উলটোদিকে খালি তক্তাপোশে। বাঁদিকের ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে হোস্টেল?'

'ভাল।' অজয়ের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

'নাম কী?'

'অজয় দেববর্মা।'

'তার মানে তুই রাজার জাত?' দ্বিতীয় ছেলেটি হাসল।

'আমি জানি না।'
'এবার জানবি। তোর বাপ কী করে? আন্ডারগ্রাউন্ডে?'
'না। উনি ব্যবসা করেন। ছোট ব্যবসা!'
'মিথ্যে কথা। তোর বাড়িতে কটা রাইফেল আছে বল!' তৃতীয়জন প্রশ্ন করল।
'সত্যি বলছি, আমরা অস্ত্র রাখি না।'
'ত্রিপুরাটা কার? তোর বাবার?'
'না, তা কেন হবে—!' হকচকিয়ে গেল অজয়।
'তুই তো উপজাতি, আমরা বাঙালি, বাঙালি খেদাবি না?'
'আমি ওসবের মধ্যে নেই, আমি রাজনীতি করি না।'
'খাটের ওপর উঠে দাঁড়া—।'
'কেন?'
'দেখব, তোর সব সম্পত্তি মানুষের মতো কি না। প্যান্ট খোল, জলদি—!' একজন উঠে ওর প্যান্টে হাত দিতেই সে নিজেকে বাঁচাতে চাইল। শক্তি প্রয়োগ করতে হল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপরে। শরীর নগ্ন করল, শুইয়ে দিল উপুড় করে। তারপর সিগারেট জ্বালিয়ে আগুন চেপে ধরতে লাগল পিঠে, নিতম্বে। মুখ চেপে ধরেছিল একজন বালিশে। একটা সময় শুধু গোঙানির আওয়াজ বেরুতে লাগল গলা দিয়ে। তখন ওরা একটু সরে দাঁড়াল, 'মন দিয়ে শোন। কেউ যেন জানতে না পারে। হোস্টেলে প্রথম ঢুকলে এসব হয়। এ বছর আমরা দলে ভারী। যখনই আমাদের দেখবি, নমস্কার করবি। আর সুপারকে যদি নালিশ করিস তা হলে ওই জিভ তোর মুখে থাকবে না।' ওরা চলে গিয়েছিল।

সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেল অজয়। কোনওমতে উঠে দরজার কাছে পৌঁছে সে কেঁদে উঠল। ছুটে এল দারোয়ান। তারপর এলেন সুপার। ওর নগ্ন শরীরে কাপড়ের আড়াল দেওয়া হল। ভদ্রলোক ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে, কে করেছে? সব আমাকে খুলে বলো। আই উইল টেক অ্যাকশন।' কথা বলার ক্ষমতা ছিল না অজয়ের। তখনই ওকে হাসপাতালে পাঠানো হল। খবর পেয়ে কলেজের অধ্যক্ষ চলে এলেন হোস্টেলে। সমস্ত আবাসিকদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করা হল। সবারই এক উত্তর, অজয়কে তারা কখনও দেখেনি, চেনেও না। এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও সংযোগ নেই। শুধু বাঙালি আবাসিক নয়, উপজাতি আবাসিকরাও একই কথা বলল।

রাত তখন একটা। আগরতলার খেলার মাঠের পাশে হরিগঙ্গা রোডের একটি বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠল। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে, শুধু তিরিশ পেরোনো এক যুবক তাঁর কম্প্যুটারের সামনে বসে কাজ করছিলেন। ফোনটা তাঁকেই ধরতে হল, 'হ্যালো।'
'ঘটনাটা শুনছ?' পরিচিত গলা। বেশ পরিচিত।
'কোন ঘটনাটা?'
'তা তো জিগ্যাইবাই। শালা ঠিক টাইমে তুমরা কানে পট্টি বাইন্ধা থাক। মহারাজার

কলেজ হোস্টেলে আমার ভাগিনাকে যারা মাইর‍্যা ফেলতেছিল তারা কে?'

'আপনার ভাগ্নে? ওখানে থাকে?'

'হ! আজই প্রথম ভর্তি হইছিল। রিপোর্টার, আমার ভাগিনার যদি কিছু হয় তা হলে আমি হোস্টেল উড়াইয়া দেব।'

'ঠিক কী হয়েছে বলবেন?'

'তুমি খবর নাও। ভাগিনাটাকে বাঁচাও।' লাইনটা কেটে দেওয়া হল।

রিপোর্টার সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেলে টেলিফোন করলেন। রিং হচ্ছে। বেশ কিছুটা সময়ের পর হোস্টেলের দারোয়ান রিসিভার তুলল, 'কে?'

'আমি রিপোর্টার ঘোষ বলছি। সুপার আছেন?'

'না নেই।'

'আজ হোস্টেলে কী হয়েছে?'

'আমি জানি না কিছু। সুপার এখন হাসপাতালে—!'

'হাসপাতালে কেন?'

'একজন নতুন ছেলের শরীর খারাপ হয়েছে, তাকে নিয়ে গিয়েছেন।'

'কী নাম ছেলেটির।'

'অজয় দেববর্মা।'

'মাই গড।' রিসিভার রেখে চটপট তৈরি হয়ে নিলেন রিপোর্টার। তারপর জিপ বের করে ছুটলেন হাসপাতালে। অত রাত্রে সুপারকে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। কী কী হয়েছিল তার অমানুষিক বিবরণ শুনল সে।

'কিন্তু এই বীভৎস অত্যাচার কেন করল?'

'এটাই বুঝতে পারছি না। র‍্যাগিং প্রতি বছর হয়, এরকম বাড়াবাড়ি কখনও হয়নি।'

'অজয়ের সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

'ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন।' সুপার জানালেন, 'এখন ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে? রিপোর্টার, আমি চাইছি না এটা নিয়ে কাগজে লেখালেখি হোক!'

'কেন চাইছেন না? এই যে প্রতি বছর নিরীহ ছেলেগুলোর ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার করা হয় তা বন্ধ হোক আপনি চাইবেন না?'

'নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু ভেবে দেখুন, এই ঘটনা প্রচারিত হলে কলেজের কতখানি দুর্নাম হবে! কে অপরাধী তা আমরা এখনও ধরতে পারিনি।' সুপার বললেন।

'কিন্তু এই ছেলের বাবা যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যাকে আমি পড়তে পাঠিয়েছি তার এই অবস্থা হল কেন, তা হলে কী জবাব দেবেন?'

সুপার চুপ করে রইলেন। রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিশ আসেনি?'

'না। এখনও বোধহয় ওদের খবর দেওয়া হয়নি। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?'

'আমি ফোন পেয়েছি। আপনার হোস্টেলের বাঙালি ছেলেরা কাজটা করেছে?'

'আমি জানি না। ওরা সবাই অস্বীকার করেছে। এমনকী উপজাতি ছেলেরাও ওদের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করেনি।'

রিপোর্টার বললেন, আমি আপনার হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

অজয় তো এখন ঘুমোবে। আপনি চলুন, আমাকে সাহায্য করবেন।’

‘এত রাত্রে? ওরা তো এখন ঘুমোচ্ছে।’

‘ঘুম থেকে তোলা এমন কিছু পরিশ্রমের কাজ নয়। তা ছাড়া একজন আবাসিক এভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে শুয়ে থাকলে ওদের কারও কারও ঘুম না আসাই স্বাভাবিক।’

সুপারকে গাড়িতে তুলে রিপোর্টার চলে এলেন হোস্টেলে। দারোয়ানকে বলা হল প্রতিটি আবাসিককে এখনই ঘুম থেকে তুলে হলঘরে নিয়ে আসতে। এরকম ঝামেলার ব্যাপারে সুপারের আপত্তি ছিল। কিন্তু রিপোর্টার তাঁকে বললেন, ‘এটা আপনার হোস্টেলের স্বার্থেই করা দরকার। অজয়ের ওপর নিশ্চয় বাইরের কেউ অত্যাচার করেনি। ওর ওপর অত্যাচার করা হয়েছে এই খবরটা ইতিমধ্যে যাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে তাদের নিরীহ ভাবার কোনও কারণ নেই। দেখুন, প্রেস জানল না, পুলিশও না অথচ তারা জেনে আমাকে টেলিফোনে হুমকি দিয়েছে। ওই ছেলেগুলোর নিরাপত্তার জন্যেই আমি আপনাকে বিব্রত করছি।’

সুপার বড় বড় চোখে তাকালেন। ব্যাপারটা এত দূরে পৌঁছে গিয়েছে তিনি ভাবতে পারেননি।

ঘুমঘুমে চোখে ছেলেরা এসে দাঁড়াল। নিরীহ চেহারার ছেলেগুলোর বেশির ভাগের উর্ধ্বাঙ্গে কাপড় নেই, শুয়েছিল পাজামা পরে। সেই অবস্থায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। সুপার খুব গম্ভীর গলায় রিপোর্টারের পরিচয় দিলেন। রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘অজয় এখন হাসপাতালে। তোমরা কি যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্যে দুঃখিত?’

একজন-দুজন শেষপর্যন্ত সবাই মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল।

‘অজয় বাঙালি নয় এবং তোমরা জানো উপজাতিরা এখন কীরকম ভাবাবেগে আক্রান্ত, তোমরা কি জানতে না এমন কাণ্ড করলে ওই আবেগ আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে এবং সেই আগুন থেকে তোমরাও রক্ষা পাবে না।’ রিপোর্টার গলা তুললেন।

একটু গুঞ্জন উঠল। একজন বলল, ‘স্যার, আমাদেরও আবেগ আছে!’

‘ঠিকই। আবেগ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব ভাবতে খারাপ লাগে। কিন্তু তার প্রকাশ কি এই? একটি নিরীহ ছেলের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করলে কি তোমাদের আবেগ সম্মানিত হবে?’

এবার সবাই চুপ করে রইল। রিপোর্টার বললেন, ‘আমি জানতে চাই না কে বা কারা এই কাজ করেছে। কিন্তু আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাই, ভবিষ্যতে এধরনের কাজ আর হবে না।’

কেউ কোনও কথা বলছিল না। হঠাৎ একজন প্রশ্ন করল, ‘আপনি কে?’

‘আমি কে সে কথা তোমাদের সুপার তো জানিয়েছেন।’

‘কিন্তু আপনি তো অজয়ের কেউ নন। আপনি বাঙালি!’

রিপোর্টার সুপারের দিকে তাকালেন। হাসলেন। তারপর বললেন, ‘আমি একজন মানুষ। যে কোনও সভ্য শিক্ষিত মানুষের মতোই আমি চাই না এই ধরনের কাজ হোক।’

'কিন্তু ওরা তো তা করে না। ওরা একজন বাঙালিকে ধরে নিয়ে গিয়ে পঁচিশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায়। টাকা না পেলে মেরে ফেলে। তার কঙ্কালের জন্যেও পাঁচ লক্ষ টাকা চায়। সেটা কি কোনও মানুষের কাজ?' ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'তা হলে তোমরা কি এসব কাজের বদলা নিতে চাও?'

একেবারে সামনে দাঁড়ানো সদ্য গোঁফ ওঠা এক তরুণ বলল, 'না। আমি চাই সরকার এগিয়ে এসে ব্যবস্থা নিক। ওদের বোঝাক। তা না হলে অন্যায় সহ্য করা খুব মুশকিল হবে।'

'নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত হবে। কিন্তু অজয়ের মতো সাধারণ নিরীহ ছেলেকে যন্ত্রণা দিয়ে তো এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তা ছাড়া এই ঘটনা ঘটিয়ে তোমরা ওদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে গেছ। আমি চাই না তোমাদের ক্ষতি হোক। ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিলে আমি ওদের বোঝাতে পারি।' রিপোর্টার বললেন।

মাঝখানে দাঁড়ানো এক তরুণ বলল, 'আমাদের সবাই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে এই হোস্টেলে কোনওরকম র‍্যাগিং হবে না। কাউকে কষ্ট পেতে দেব না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সুপার ইশারা করতে ওরা ফিরে গেল নিজের নিজের ঘরে। রিপোর্টার বললেন, 'সহযোগিতার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। হাসপাতালে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে ওরা দু-একদিনের মধ্যেই অজয়কে ছেড়ে দেবে। যতটা না ও শরীরে আহত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি মনে ধাক্কা খেয়েছে। ওকে এখানে নিয়ে এসে ছেলেদের সঙ্গে যতটা সম্ভব সহজ মেলামেশার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

সুপার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ওদের জানাবেন কী করে?'

'কাদের? ও। হ্যাঁ, ওরাই যোগাযোগ করবে। ওদের সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারে না যদি না ওরা নিজেরা কথা বলতে চায়। আপনি তো জানেন পুলিশ ওদের খোঁজ পাচ্ছে না।'

'তা হলে? আমার হোস্টেলের ছেলেদের নিরাপত্তার জন্যে কি পুলিশকে ব্যাপারটা জানাব।'

'জানাতে আপনি অবশ্যই পারেন। কিন্তু পুলিশ কতদিন এই হোস্টেলকে পাহারা দেবে? তা ছাড়া ওরা যখন কলেজে যাবে তখন? দেখুন, আপনি যা ভাল মনে করেন!' রিপোর্টার হোস্টেল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আগামী তরশু কালাদিবস। পনেরোই অক্টোবর উনিশশো ঊনপঞ্চাশ। ত্রিপুরার রানি ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখনও ত্রিপুরায় উপজাতির মানুষেরা বিশ্বাস করেন যে রাজা যদি তখন নাবালক না হতেন তা হলে ভারত সবকারের কাছে ত্রিপুরা সমর্পিত হত না। ব্রিটিশরা যখন সমস্ত পৃথিবী জয় করতে তৎপর তখন তারা নেপাল ভুটানে যেমন ঢোকেনি তেমনই

ত্রিপুরার রাজাকেও অসম্মান করেনি। পার্বত্য ত্রিপুরার ওপর রাজার কর্তৃত্ব তারা মেনে নিয়েছিল। হ্যাঁ, হয়তো সমতলে রাজার ভূমিকাকে ওরা প্রায় জমিদারের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল কিন্তু কিছুটা কর দিয়ে রাজা প্রায় আগের সম্মানেই থেকে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মানচিত্রে ত্রিপুরা চিহ্নিত হলেও রাজাই ছিলেন শেষ কথা। ত্রিপুরার মানুষ তাঁকে শুধু শ্রদ্ধাই করে না, ভালওবাসে। রাজার অপমান তারা সহ্য করতে পারে না। পনেরোই অক্টোবরকে তাই তারা কালাদিবস হিসেবে চিহ্নিত করল। প্রতি বছর ওই দিনটিকে তারা ক্ষোভ প্রকাশের দিন হিসেবে বেছে নিল। বর্তমান রাজা কিরীট বিক্রমমাণিক্য বাহাদুরের বাবা বীর বিক্রমমাণিক্য বাহাদুর ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা। তাঁর মৃত্যুর পর নাবালক রাজার পক্ষে দায়িত্বভার নিয়েছিলেন মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী। রাজপরিবারের ইতিহাসে তাঁর মতো বিদূষী সুন্দরী এবং বিচক্ষণা রানি আর কেউ ছিলেন না। এসব এখন ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাসের মধ্যেই উপজাতিদের বিক্ষোভের কারণগুলো ছড়িয়ে আছে।

বাড়িতে ফিরে এসে কম্প্যুটারে লেখা শেষ করলেন রিপোর্টার। এই রিপোর্ট পৌঁছে গেল সাতসমুদ্র ওপারে পৃথিবীবিখ্যাত টেলিভিশন সংস্থার নিউজরুমে। রিপোর্টের শেষে অজয়ের খবরটা দিলেন তিনি। কলেজ হোস্টেলে নবাগত ছেলেকে র‍্যাগ করা হয়েছে এটা নতুন খবর নয়। কিন্তু যারা করেছিল তারা সেই রাতেই কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা চেয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনাকে প্রশ্রয় দেবে না। এটাই খবর।

ঘুমোতে যাওয়ার আগে সাগরপারের টেলিভিশন সংস্থাটির নিউজ বুলেটিন শুনল রিপোর্টার। এশিয়ার খবরে তাঁর পাঠানো সংবাদকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এখন ভোর। অন্তত ঘণ্টা চারেক চোখ বোজার জন্যে চেষ্টা করতেই টেলিফোন বাজল। রিপোর্টার রিসিভার তুললেন, 'হ্যালো।'

'হেই রিপোর্টার। তোমার খবর হুনলাম। তা হলে আর কোনও ঝামেলা নাই?'

'না। নেই।'

'যারা করেছে তাদের নামগুলো বলো।'

'ঝামেলা যখন নেই তখন আর তাদের নামের কী দরকার?'

'ঠিক আছে, তুমার কথা রাখলাম।'

'আপনি এখন কোথায়?'

'তুমার সম্পর্কে যা জানি তাতে তো এত বোকা মনে হয় নাই।'

'বুঝলাম। কালাদিবসে আপনাদের কর্মসূচী কী?'

'কিস্যু না। ওসব কইর‍্যা কোনও লাভ হয় না। বোকা খাসির মতো প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়া রাস্তায় হাঁটলে দিনটা সাদা দিবস হবে?'

লাইনটা কেটে দেওয়া হল।

এক দিকে চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্ট, অন্য দিকে মিজোরাম এবং অসম। ভারত এবং বাংলাদেশ ছাড়া খুব কাছের বিদেশি রাষ্ট্র হল আরাকান। কিন্তু তাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই। রাজধানী শহর আগরতলায় বাংলাদেশের নিশ্বাস

সবসময় লাগে। বাংলাদেশের আখাউরা থেকে যে রাস্তাটা একেবারে শহরের বুকে চলে এসেছে তারও নাম আখাউরা রোড। ঊনপঞ্চাশ সালের পনেরোই অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্গত হয়ে গেল। ত্রিপুরার মাটি ভারতের মাটি। এই সরল সত্যটি মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছিল অনেকের। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে ত্রিপুরায় সরাসরি যেতে যথেষ্ট বেগ পোয়াতে হয়। অসম থেকে ঘুরে ঘুরে ত্রিপুরায় পৌঁছোনোর হ্যাপা অনেক। এই সেদিন, উনিশশো তেরো সালে, যখন গোটা পৃথিবী মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে কাঁপছে তখনও ত্রিপুরা অপেক্ষাকৃত শান্ত। মহারাজার বাঙালিপ্রীতি ছিল। নানান সরকারি পদে তিনি শিক্ষিত বাঙালিদের নিয়ে আসছেন। সম্মানিত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা দায়িত্ব সম্পাদন করছেন। চাষবাস এবং শ্রমনির্ভর কাজের জন্যে পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ নিয়ে এসেছেন মহারাজা, যাঁরা পরিশ্রম করতে পারেন। এই বহিরাগতদের সে সময় সন্দেহের চোখে দেখেনি ত্রিপুরার আদি বাসিন্দারা। মহারাজা যা করছেন তা ভালর জন্যেই করছেন, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। বস্তুত সমস্ত রাজ্যশাসন সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয়েছিল মহারাজের এই সিদ্ধান্তে। যে পার্বত্য ত্রিপুরার তিনি একেশ্বর সেখান থেকে তাঁর তেমন আয় হত না। ইংরেজদের কর দিয়েও সমতল থেকেই তিনি যথেষ্ট সম্পদ সংগ্রহ করতেন।

ক্রমশ বাঙালির সংখ্যা বাড়তে লাগল। দেশ বিভাগের আগে থেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষের আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর পাকিস্তান আমলে চট্টগ্রাম বা শ্রীহট্টের সীমানা পেরিয়ে বাঙালিদের অনেকেই চলে এলেন এপারে। ত্রিপুরায় ক্রমশ একটি মিশ্রিত বাঙালি জাতি গড়ে উঠল যাঁদের সঙ্গে শিক্ষিত বা সংস্কৃতিমনা উপজাতি মানুষের কোনও বিরোধ ঘটল না। যেমন, শচীন দেববর্মন। ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু বাঙালি তাঁকে বাঙালি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেনি। বাংলায় গান গেয়েছেন, জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছেন বোম্বেতে গিয়ে। কিন্তু এই মিশ্রণ পছন্দ হচ্ছিল না অনেকেরই। যেহেতু বাঙালিদের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনীতির বদল হচ্ছিল তাই ট্রাইবাল ন্যাশনাল ফ্রন্টের জন্ম হল উনিশশো আটাত্তর সালে। প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যেতে লাগল সেইসময় থেকে। সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে গেল। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীরা বিশেষ করে নৃপেন চক্রবর্তী বুঝেছিলেন অস্ত্র দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। যার পরিণতিতে পৃথক স্বঘোষিত জেলা পরিষদের জন্ম হল ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ সিডিউল অনুযায়ী। কিন্তু তাতেও শান্তি এল না। বাহাত্তর শতাংশ বাঙালি ত্রিপুরায় জনসংখ্যা দখল করে রেখেছে এটা মেনে নিতে পারছিলেন না উপজাতি নেতারা। সশস্ত্র সংগ্রামে পরাজয় অনিবার্য তবু ছোটখাটো সংঘর্ষ চলছিল। কিন্তু আরও টাকা দরকার। অস্ত্র কেনার টাকা, প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্যে যা হাতে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। রোজগারের সহজ পথটাই বেছে নিলেন তাঁরা।

ঘুম ভাঙল বেলা বারোটায়। ঘরে ঢুকল নীলা, হাতে চায়ের কাপ। হেসে বলল, 'এরকম অনিয়ম করলে শরীর থাকবে?'

'আর শরীর।' হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল রিপোর্টার বাসুদেব ঘোষ, 'যা অবস্থা

তাতে মনে হচ্ছে আমার আর বিছানায় আরাম করে শুয়ে মরা হবে না।'

'তার মানে?'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে। একটা বুলেট ছুটে আসবে—, ব্যস।'

'তুমি এই চাকরি ছেড়ে দাও।'

'আমাকে পাগলা মশা কামড়ায়নি নীলা।'

'আমি বলছি তুমি ছেড়ে দাও চাকরিটা। আমাদের যা জমিজমা আছে তাই দেখাশোনা করো, কোনওদিন অভাব হবে না।' নীলার গলায় অনুরোধ।

চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল বাসুদেব। আলমারিতে যত্নে রাখা সুন্দর শক্তপোক্ত লাঠিটা বের করে নীলার সামনে ধরল সে, 'এই লাঠিটা আমাকে কে দিয়েছিলেন তা তুমি জানো।'

'তুমি ওই জায়গাতেই আটকে আছ। কবে মহারাজা কিরীট বিক্রমমাণিক্য বাহাদুর তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল হওয়ার জন্যে দিয়েছিলেন আর সেই থেকে তুমি ভেবে চলেছ ওই লাঠি দিয়ে লড়াই করবে।' নীলা চলে যাচ্ছিল।

'দাঁড়াও। মহারাজা আমাকে লাঠিটা দিয়েছিলেন লড়াই করার জন্যে নয়। দিয়েছিলেন ভালবেসে। তবে লড়াই করার সুযোগটা আমিই নষ্ট করেছি।'

'অনেকবার শুনেছি সেই গল্প. শোনো. বাবা আমাদের আজ বিকেলে যেতে বলেছেন।'

'ওহো, আজই তো তাঁর শেষদিন।'

'শেষদিন মানে?' খেঁকিয়ে উঠল নীলা, 'আজ বাবা অবসর নিচ্ছেন।'

'দেখো, আমি রিপোর্টারের চাকরি করছি বলে তুমি ভয় পেয়ে আপত্তি জানাচ্ছ, আর তোমার বাবা সারাজীবন পুলিশে চাকরি করে আজ ডি আই জি হয়ে অবসর নিচ্ছেন। তোমরা তাঁকে কখনও চাকরি ছাড়ার কথা বলনি। কেন বলনি?'

'কারণ বাবা একা থাকতেন না। বডিগার্ড তো ছিলই। পুরো পুলিশ ফোর্স ওঁকে প্রোটেকশন দিত। যাও, স্নান সেরে এসো, আমি ভাত দিচ্ছি।'

বাসুদেবের ছাত্রজীবন শুরু হয়েছিল দেরাদুনে। বাবা মেজর ছিলেন। আর পাঁচটা ছেলের থেকে এই ছেলে আলাদা, বুদ্ধিমান, ভাল ইংরেজি বলে। তাই তিনি আশা করেছিলেন ছেলে খুব বড় আর্মি অফিসার হবে। কিন্তু স্কুলের শেষ ধাপে এসে সব গোলমাল হয়ে গেল। একজন পঞ্জাবি অফিসার অকারণে বাঙালিদের গালাগাল করছিল। বাঙালি অলস, মছলি না খেলে পাগল হয়ে যায়। বাঙালির উচিত মায়ের কোলে শুয়ে থাকা। ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনতে শুনতে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল বাসুদেবের। সোজা এগিয়ে গিয়ে অফিসারটিকে বলেছিল, 'আপনি এভাবে কথা বলবেন না!'

তার গলার স্বরে লোকটা রেগে গিয়েছিল, 'তুমি একটা বাচ্চা ছেলে হয়ে আমার ওপর দাদাগিরি করতে এসেছ? বেশ করেছি বলেছি। ভাগো হিঁয়াসে।'

মাথার রক্ত চড়ে গেল বাসুদেবের। বিদ্যুৎগতিতে হাত চালাল সে। সর্দারজি এর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অপমানিত সর্দারজি কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী বিচার হল এবং

বাসুদেবকে চিরকালের জন্যে শুধু স্কুল থেকে বিতাড়িত করাই নয়, ভারতের নৌ-আকাশ অথবা সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল।

ছেলের এই কাজের জন্যে বাবা প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে পাঠিয়ে দিলেন আগরতলায়। ইংরেজিটা ভাল শিখেছিল তাই আগরতলার স্কুলে ভর্তি হতে পারল সহজেই। স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে যে পড়াশুনা তার ফল রীতিমতো ভাল। সেখান থেকে দিল্লির জে এন ইউ-তে তালিম নিয়ে খবরের কাগজের চাকরি। এই চাকরির কারণে তাকে ছুটতে হয়েছে উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে। পাহাড়ি রাজনীতির উদ্দাম স্রোতের সঙ্গে ক্রমশ পরিচিত হয়ে যাচ্ছিল তরুণ সাংবাদিক। পূর্ববঙ্গ থেকে যে পূর্বপুরুষটি বহুকাল আগে মহারাজের আমন্ত্রণে ত্রিপুরায় গিয়ে শেকড় গেড়েছিলেন তাঁর চেহারায় হয়তো মঙ্গোলিয়ান ছাপ ছিল। এবং জন্মসূত্রে সেই ছাপের কিছুটা বাসুদেবের আদলেও আসায় বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পাহাড়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাকে অনাত্মীয় ভাবেনি। একই সঙ্গে এই অঞ্চলের অনেকগুলো ভাষা আয়ত্তে এসে গিয়েছিল। ফলে বিদেশি টিভি কোম্পানি তাকে সানন্দে গ্রহণ করেছিল বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে। সেই কোম্পানির রেডিয়োতেও তার পাঠানো রিপোর্ট প্রচার করা হত। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে-সমস্ত নেতা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপন ডেরায় রয়েছে তারাও রেডিয়োতে ওই রিপোর্টগুলো নিয়মিত শোনে এবং আপত্তি থাকলে টেলিফোনে যোগাযোগ করে। এদের অনেকের সঙ্গেই মুখোমুখি দেখা হয়নি বাসুদেবের।

আগরতলার পুলিশ লাইনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ ভাল। শ্বশুরমশাইয়ের নাম পি বি বসু। ত্রিপুরা পুলিশের ডি আই জি ছিলেন, আজ অবসর নিলেন। ভদ্রলোকের দুই ছেলে মেয়ে। বড় ছেলে ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তারির চাইতে সাহিত্য নিয়ে মগ্ন থাকতে বেশি পছন্দ করে সৌমিত্র। সরকারি চাকরিটা করতে হয় বলেই করে। আড্ডাটা মনের মতো হলে সে পৃথিবী ভুলে যায়। পি বি বসু পুলিশের বড়কর্তা হলেও নিরীহ ধরনের মানুষ। চেহারাটিও বড়সড় নয়। মেয়ের বিয়ের সময় যা কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন ওঁর স্ত্রী।

বাইরের ঘরে বসেছিলেন পি বি। একা। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। বাসুদের আর নীলাকে ঢুকতে দেখে তিনি হাসলেন। বাসুদেব বলল, 'শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেন?'

'তার মানে?'

'পুলিশের দক্ষতা আপনারা এমন জায়গায় নামিয়ে আনছিলেন যে যে-কোনও মুহূর্তে একটা বুলেট আপনার বুকে চুপচাপ ঢুকে যেতে পারত। অবশ্য আজ অবসর নিয়েছেন বলে ভাববেন না আপনি কারও টার্গেট নন। একা একা শহরে ঘুরে বেড়াবেন না।' বাসুদেব বসল।

পি বি বললেন, 'মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি আমার জামাই নও।'

'ভাল কথা শোনার অভ্যেস আপনার নেই, কী করা যাবে।'

নীলা বলল, 'তোমরা কি এখন নতুন বাড়িতে শিফ্‌ট করবে বাবা?'

'ছয় মাস তো থাকা যাবে। তোমাকে একটা খবর দিই হে, এবার কালাদিবসে

আমরা খুব কড়াকড়ি করছি। কোনওরকম শান্তিভঙ্গ করার চেষ্টা দেখলেই অ্যাকশন নেওয়া হবে।' বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বেশ তারিয়ে তারিয়ে বললেন পি বি।

'আমরা মানে? আপনি তো এখন রিটায়ার্ড। কী দরকার এসব নিয়ে ভাবার? যাক গে, ডাক্তারসাহেব কোথায়? বাড়িতে আছে?' বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। ওর ঘরেই আছে।'

সৌমিত্র বিবাহিত। এখনও সন্তান হয়নি। দুই ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বছর চারেক আগে অথচ নাতি-নাতনি হচ্ছে না বলে ডি আই জি সাহেবের স্ত্রীর বেশ আক্ষেপ আছে। ওরা সৌমিত্রর ঘরে ঢুকে শুনল সিডিতে রবীন্দ্রনাথের গান বাজছে। সৌমিত্রর স্ত্রী আলমারি খুলে শাড়ি গোছাতে ব্যস্ত, সৌমিত্র ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছে।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'কী খবর ডাক্তারবাবু?'

'আরে! এসো এসো। বসো।'

'আজ শ্বশুরমশাইয়ের অবসরের দিন। সেলিব্রেট করতে আসতে হল।'

'হ্যাঁ। বাবা বেঁচে গেল। আমিও যদি অবসর নিতে পারতাম!'

'নিয়ে নাও। ভি আর তো নিতেই পার, পার না?'

'নাঃ। তদ্দিন চাকরি হয়নি।'

'ডাক্তারি করা সত্যি তোমার ভাল লাগছে না?'

'নট দ্যাট। কোনও বাঁধা ডিউটি করতে ইচ্ছে হয় না। পিতৃদেব বলেছেন প্র্যাকটিশ করতে। স্বাধীনতা পাওয়া যাবে। কোথায় স্বাধীনতা? তখন তো চব্বিশ ঘণ্টাই আমার থাকবে না।'

'তা হলে ডাক্তারিটা পড়লে কেন?'

'ভেবেছিলাম ত্রিপুরা গরিব রাজ্য। ডাক্তার হয়ে মানুষের কাজে লাগব। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে শুধু বই পড়ে যদি জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত। বিশ্বাস করো, হাসপাতালে গিয়ে রুটিন ডিউটি করা ছাড়া আমার কিছু করার নেই।' সৌমিত্র মাথা নাড়ল।

সৌমিত্রর স্ত্রী এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার কথা বলল, 'বাবা রিটায়ার করেছেন। চাকরি ছাড়লে কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছ?'

নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'কী বই পড়ছ দাদা?'

'বাঙালির ইতিহাস।' সৌমিত্র বলল।

এইসময় শাশুড়ি ঘরে এলেন। তাঁর হাতে একটা খাম। বাসুদেব আর নীলাকে দেখে তিনি খুশি হলেন, 'ওমা, তোমরা কখন এসেছ?'

নীলা বলল, 'এই তো, এইমাত্র।'

'আমার বুক থেকে এতদিনে পাথরটা নামল।'

বাসুদেব বলল, 'ডি আই জি সাহেবের চাকরিটা চলে যাক আপনি চাইছিলেন?'

'চলে যাওয়া চাইনি, ভালয় ভালয় শেষ হোক বলে রোজ প্রার্থনা করতাম। সেই বিয়ের পর থেকেই জানি স্বামী পুলিশ। যখন সাধারণ অফিসার ছিলেন তখন থেকেই জানতাম চোর বদমাস ডাকাতরা যে কোনও সময় প্রতিশোধ নিতে পারে। তারপর

ওইসব উগ্রপন্থীরা যখন মানুষ মারতে লাগল তখন তো—! সে সময় অবশ্য বলেছি, চাকরি ছেড়ে দাও, উনি শোনেননি। একটার পর একটা প্রমোশন নিয়ে গেছেন। ঠাকুর পাশে ছিলেন বলে আজকের দিনটা এল। তোমরা গল্প করো, আমি জলখাবারের ব্যবস্থা করছি।' শাশুড়ি বললেন।

সৌমিত্রর বউ বলল, 'মা, আপনি থাকুন, আমি যাচ্ছি।'

ভদ্রমহিলার তখন খেয়াল হল, 'এই দেখো, ভুলেই গিয়েছিলাম। দুপুরে তোর এই চিঠি এসেছিল। বউমা ঘুমোচ্ছিল বলে পরে দেব ভেবেছিলাম। আর খেয়াল নেই। নে।'

সৌমিত্র মায়ের হাত থেকে খামটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে বড় কর্তার প্রেমপত্র। যেটা কানাঘুষো শুনছিলাম সেটা বোধহয় সত্যি হল!' সে খামের মুখটা সন্তর্পণে ছিঁড়ল। সবাই দেখল চিঠিটা পড়তে পড়তে সৌমিত্রর মুখ প্রথমে শক্ত হলেও শেষপর্যন্ত হাসি ফুটল। সে বলল, 'ভালই হল।'

ওর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'কী চিঠি?'

'সরকার আমাকে জনসাধারণের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। একেবারে গ্রামে বদলি করা হয়েছে।' সৌমিত্র চিঠিটা খামে ঢুকিয়ে রাখল।

শাশুড়ি চিৎকার করে উঠলেন, 'সে কী?'

সৌমিত্রর স্ত্রী ফ্যাসফেসে গলায় জানতে চাইল, 'কোন গ্রামে?'

'বুরাখা।'

বাসুদেব বলল, 'মনে হচ্ছে হেলথ্ ডিপার্টমেন্টের কেউ তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে।'

'দুর! কারও সঙ্গে আমার ঝগড়াঝাটিও হয়নি।' সৌমিত্র হাসল।

'তোমার সঙ্গে হয়নি কিন্তু তুমি ডি আই জি সাহেবের ছেলে, এটাও তো কারণ হতে পারে।'

'বুরাখা যেতে কতক্ষণ লাগে?' সৌমিত্রর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

'কতক্ষণ আর! তবে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করা যাবে না।'

'জায়গাটা কেমন?' নীলা জানতে চাইল।

'আমি বুরাখাতে কখনও যাইনি তবে আশেপাশে গিয়েছি। খুব ভাল। চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো প্রকৃতি চারপাশে। একটাই সমস্যা হবে, তুমি বাংলায় কথা বলার মানুষ পাবে না।' বাসুদেবের কথাটা শোনামাত্র শাশুড়ি প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'কী আর করা যাবে।' সৌমিত্র বলল, 'সরকারি চাকরিতে বদলি হতেই হয়।'

ওর স্ত্রী বলল, 'হয়। কিন্তু তোমাকে ত্রিপুরার অন্য শহরে বদলি না করে গ্রামে বদলি করল কেন? আমার খুব ভয় করছে।'

পি বি বসুকে দেখা গেল স্ত্রীকে পিছনে ফেলে তড়িঘড়ি ছেলের ঘরে ঢুকতে, 'কী ব্যাপার? তোমার মা বলল ট্র্যান্সফার অর্ডার এসেছে?'

'হ্যাঁ।' সৌমিত্র স্বাভাবিক গলায় বলল, 'যেমন হয় আর কি?'

'বুরাখাতে ট্র্যান্সফার করেছে?'

'হ্যাঁ, তাই তো লিখেছে!'

'ইম্পসিব্‌ল। তুমি ওখানে যাচ্ছ না!'

'কেন?'

'ওই এলাকায় কোনও বাঙালি পা রাখতে সাহস পায় না এ কথা খবরের কাগজে পড়নি? এই যে বাসুদেব, তুমি নিশ্চয়ই বলবে না ব্যাপারটা জান না!' পি বি উত্তেজিত।

'ওই কথাই বলছিলাম। বাংলায় কথা বলতে পারবে না।' বাসুদেব বলল।

'শুধু কথা বলতে? কিছুই পারবে না। ওটা উপজাতি এলাকা। গিয়ে শুনবে সবাই সি পি এমের সমর্থক কিন্তু ওদের আশি ভাগই উগ্রপন্থীদের সমর্থন করে। এখন ওদের ধারণা হয়েছে বাঙালিরাই প্রধান শত্রু। তুমি সেই শত্রুপুরীতে কদিন থাকতে পারবে?'

বাসুদেব বলল, 'আমার একটা বিনীত জিজ্ঞাসা আছে।'

পি বি চোখ ঘোরালেন, 'চালাকি করো না।'

শাশুড়ি ধমকে উঠলেন, 'জামাইয়ের সঙ্গে এ কী ধরনের কথা! তুমি কিছু মনে করো না বাবা!' ভদ্রমহিলা সত্যি লজ্জিত হলেন।

'চালাকি নয়। আজ অবধি আপনি ত্রিপুরা পুলিশের সর্বময় কর্তাদের একজন ছিলেন। একই রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও বাঙালি থাকতে পারবে না জেনে কোনও ব্যবস্থা নেননি কেন? কেন ওদের বাড়তে দিয়েছিলেন?'

'নেওয়া হয়নি তোমাকে কে বলল? তুমি তো তোমার রিপোর্টে শুধু আমাদের সমালোচনা করে যাচ্ছ। ওরা যতক্ষণ অ্যাকশনে না নামছে ততক্ষণ আমরা কিছুই করতে পারি না। অ্যাকশনে নামলেই ব্যাপক ধরপাকড় করা হয়। ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে সেই নৃপেন চক্রবর্তীর আমল থেকেই। এ কথা তুমি জান না?' পি বি চেয়ারে বসলেন।

শাশুড়ি মাথা নাড়লেন, 'না খোকা, তুই চাকরি ছেড়ে দে। যেতে হবে না তোকে।'

সৌমিত্র হাসল, 'চাকরি ছেড়ে দিলে বাঁচব কী করে?'

পি বি তাকালেন, 'আমার সামনে কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করল না? তা ছাড়া চাকরি না করলে যদি রোজগার বন্ধ হয় তা হলে ডাক্তারি পড়েছিলে কেন? প্র্যাকটিশ করো। আমি তোমার চেম্বারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

সৌমিত্র বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তোমরা ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবছ। আমি একজন ডাক্তার। ওখানকার মানুষ গরিব। চিঠিতে হাসপাতাল লেখেনি, হেলথ সেন্টার লিখেছে। তার মানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে এলাকাটা। অতএব আমাকে ওদের প্রয়োজন হবেই। একজন ডাক্তারের ক্ষতি করা মানে নিজেদের সর্বনাশ করা এটা নিশ্চয়ই ওরা বোঝে। তা ছাড়া আমি তো চেয়েছিলাম মানুষের জন্যে কাজ করতে। এখানকার হাসপাতালের সিনিয়ররা যে পথে চলতে বলেন আমাকে সেই পথে চলতে হয়। ওখানে আমি স্বাধীনতা পাব। কী বল বাসুদেব?'

বাসুদেব মাথা নাড়ল, 'আমি একমত। ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে হলে গ্রামে

যাওয়া উচিত। এখানে তোমার যে আলস্য তা ওখানে গেলে নিশ্চয়ই কেটে যাবে। আর সত্যি তো, গ্রামের মানুষ যদি তোমার কাছ থেকে উপকার পায় তা হলে কখনওই ক্ষতি করার কথা ভাববে না।'

পি বি বসু জামাইয়ের দিকে তাকালেন, 'তুমি কি জান আমিও ওখানে মাত্র তিনবার গিয়েছি এবং পাঁচ গাড়ি পুলিশ নিয়ে!'

'হতেই পারে। কারণ আপনি তখন পুলিশ ছিলেন। ডাক্তার নয়।' বাসুদেব হাসল।

নীলা বলল, 'বাবা, তুমি এক কাজ করো। দাদা যদি সত্যি ওখানে যায় তা হলে ওর সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে দাও। এখনকার আই জি তো তোমার খুব কাছের মানুষ।'

'না না, আমার কোনও সিকিউরিটি লাগবে না। ওসব থাকলেই ওরা আমাকে সন্দেহ করবে।' সৌমিত্র তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

হঠাৎ পি বি বসু বাসুদেবের দিকে তাকালেন, 'তুমি কী বল?'

বাসুদেব কাঁধ ঝাঁকাল, 'আপনার নাম পি বি। আপনি আমার চেয়ে ভাল বুঝবেন।'

পি বি বসু তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

নীলা বলল, 'তুমি বাবার পেছনে খুব লাগ। বয়স মান্য কর না।'

শাশুড়ি বললেন, 'খারাপ কী বলেছে। কিন্তু খোকা তোর কোনও বিপদ হবে না তো?'

'তুমি একদম চিন্তা করো না। তবে বাবাকে বলবে পুলিশ না পাঠাতে।' সৌমিত্র বলল।

বাসুদেব বলল, 'ওগুড়ে বালি! ওখানে কোনও থানা নেই। কোনও পুলিশ তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিতে যাবে না। যাক গে, তুমি এখন একাই যেয়ো। যদি বোঝ সব ঠিক আছে তা হলে ম্যাডামকে নিয়ে যেতে পারো।'

সৌমিত্রর বউ বলল, 'বয়ে গেছে। ওই অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে আমি কিছুতেই থাকব না।' ওর বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে ফেলল। এমনকী শাশুড়িও।

সৌমিত্র শেষপর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে কর্মস্থানে চলে গেল। যাকে এতকাল অলস বলে মনে হত সে যে হঠাৎ এরকম সক্রিয় হতে পারে তা কেউ ভাবতে পারেনি। বাসুদেব শ্যালকের এরকম সাহসিকতায় খুশি হল। কালাদিবসের আগের রাত্রে টেলিফোন বাজল। বাসুদেব হ্যালো বলতেই শুনতে পেল, 'রিপোর্টার বলতেছ?'

'হ্যাঁ, কে?'

'তপন রিয়াং।'

বাসুদেব তৎক্ষণাৎ টেপ রেকর্ডার চালু করল। তপন রিয়াং টাইগার গ্রুপের ওপরতলার নেতা। সে হেসে বলল, 'কী খবর? হঠাৎ আমাকে ফোন?'

'খবর আছে। আরে এই খবর ফরেনে পাঠাইয়া তুমি পয়সা কামাইবা।'

'তা সত্যি। খবরটা কী?'

'কাল কালাদিবস। শক্তি কারে বলে আমরা এবার দেখাই দিমু। পুরা ত্রিপুরায়

আগুন জ্বলবো। বুঝলা? তারা খুব পুলিশ নামাইছে আগরতলায়। আরে আগরতলা মানে তো পুরা ত্রিপুরা না। তোমার রেডিয়ো টিভিতে খবরটা বাজাবা।' টেলিফোন ছেড়ে দিল তপন রিয়াং। ক্যাসেটটা রি-উইন্ড করে আবার শুনল বাসুদেব।

ত্রিপুরার জঙ্গি সংগঠনগুলো মাঝে মাঝেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। কোনও খবর থাকলে মাতব্বরের মতো শোনায়। তাদের উদ্দেশ্য বাসুদেবের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবী খবরটা জানুক। কথা বলতে বলতে এদের অনেককেই জেনেছে সে। শুধু টাইগারের দল নয়, ন্যাশনাল লিবারেশনের কয়েকজনের গলা চিনে ফেলেছে সে। কিন্তু কিছুতেই ওদের টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করতে পারেনি। সাধারণত মোবাইলে কথা বলে ওরা। নাম্বার চাইলে বলে, 'রিপোর্টার তুমি তো বাঙ্গালি। আমাদের গর্দভ ভাবতেছ নাকি?'

কালাদিবস উপলক্ষে এই হুমকির রিপোর্ট পাঠাতে গিয়েও মন পরিবর্তন করল সে। এরকম একটা গরম খবর পাঠানোর পর যদি পর্বতের মূষিক প্রসব হয়? কেউ টেলিফোনে তাকে কিছু বলল আর সে বিশ্বাস করে বসল। বাসুদেব পুলিশের এক বড় কর্তাকে ফোন করল। ভদ্রলোক বললেন, 'আরে মশাই, শুধু আগরতলা কেন, ত্রিপুরার যে কোনও বড় শহরে ঢুকলে ওদের ছাতু করে দেব আমরা। পার্বত্য ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে যা ইচ্ছে করুক। করলে নিজেদের গায়ে নিজেরাই আগুন দেবে। বুঝতেই পারছেন।'

খবরটা হেড কোয়ার্টার্সে পাঠাল না সে।

কালাদিবসের সন্ধেবেলায় নিশ্চিন্ত হল বাসুদেব। খবরটা প্রচারের জন্যে না পাঠিয়ে সে ঠিক করেছে। একটাও মিছিল বের হয়নি ত্রিপুরার কোনও শহরে। পুলিশকে হতাশ করে কোনও জঙ্গি নেতা আত্মপ্রকাশ করেনি। শুধু গ্রামেগঞ্জে কিছু কিছু বাড়িতে কালো পতাকা তোলা হয়েছে। গ্রামের স্কুলগুলোতে জোর করেই কালো পতাকা উড়িয়েছে ওরা। এইটুকুই। ওই তপন রিয়াং নিশ্চয়ই জানত এই ঘটনাই ঘটবে তবু তাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। আতঙ্ক সৃষ্টি করে ওরা মজা পায়।

পরের দিন চিঠি পেল বাসুদেব। সৌমিত্র লিখেছে বুরাখা থেকে।

'আগরতলায় বসে মান্দাই-বুরাখার নাম শুনলেই বাঙালিরা আতঙ্কিত হয়। সেই উনিশশো আশি সালের ছয়ই জুনের কথা কেউ ভুলতে পারে না। সেই দিন উপজাতি-বাঙালি রায়টে মান্দাইতে সাড়ে চারশো আর বুরাখাতে দেড়শো বাঙালি মারা গিয়েছিল। আর তারপর থেকে এই অঞ্চল থেকে বাঙালি পালাতে আরম্ভ করেছিল। এখানে আসার পর মনে হচ্ছে ভয়টাকে আমরা অযথাই লালন করে চলেছি। উত্তেজনা যেমন আকস্মিক হয়েছিল তেমনই তার কমে যেতেও বেশি সময় লাগে না। কাশ্মীরের উত্তেজনা যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দিন থেকে শুরু হয়ে এখনও প্রবলভাবে বেঁচে আছে, এবং সেটা আছে পাকিস্তানের কারণে, ত্রিপুরায় সেই ধরনের উত্তেজনার কোনও কারণ নেই বলেই আমার বিশ্বাস। বাঙালিদের এই রাজ্যে এনেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা, তাঁর রাজকাজের প্রয়োজনে। তারা এতকাল এখানে

থেকে এই রাজ্যের মানুষ হয়ে গেছে। উপজাতিদের সে কথাটা কেউ বোঝাতে চায়নি। তুমি বলবে, ওরাই বুঝতে চায়নি। যাক গে। এখানে আমি ভালই আছি।

'বেশ কিছুদিন আগে সরকার এখানে হাসপাতালের পরিকল্পনা করেছিলেন। কয়েকটা ছাড়া পুরো বিল্ডিং-ই এখন পুলিশের দখলে। তাদেরই আস্তানা হয়ে গেছে। হাসপাতালের কাজকর্ম গোটা তিনেক ঘরেই চলে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত ওষুধ আছে কিন্তু কর্মচারীর অভাব। আমি ছাড়া আর একজন ডাক্তার আছেন। কিন্তু শুধু ওষুধ দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। বড়সড় ফোড়া অপারেশনের ব্যবস্থা নেই। ছোটখাটো অপারেশন করার কোনও উপায় নেই। আমি সার্জেন নই। সহযোগী ডাক্তারও নন। তিনি সাহস পাননি। আমি দুটো কেসে বাধ্য হয়েছি অপারেশন করতে। লোক্যাল অ্যানাসথিসিয়ার সাহায্যে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই। কিন্তু তাতেই পেশেন্ট রিলিফ পেয়েছে। এই ঢালতলোয়ার ছাড়া যুদ্ধ করায় ঝুঁকি আছে। কিন্তু সেটা করায় গ্রামের মানুষ আমাকে সানন্দে গ্রহণ করেছে। এর ফলে কিছু সমস্যাও হয়েছে। পেটে টিউমার নিয়ে এসে বলছে অপারেশন করে দিতে যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

'বাবা মা যে ভয় পেয়েছিল তার কোনও কারণ আমি দেখছি না। যার কাছ থেকে উপকার পাওয়া যাচ্ছে তার কোনও ক্ষতি ওরা নিশ্চয়ই করতে চাইবে না। সামনের শনিবার আমি আগরতলায় যাব। তখন দেখা হবে। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে এসে ঘুরে যেতে পারো। সৌমিত্র।'

শ্বশুরবাড়িতে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল বাসুদেব। দুশ্চিন্তার কিছু নেই, সৌমিত্র ভাল আছে। দু'দিন বাদে সে চলে গেল কলকাতায়। অফিসের কাজে। তার কেন্দ্রীয় সংস্থার দুজন বড়কর্তা জাপান ঘুরে সেখানে আসছেন। তাঁরা তার কাছে উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে কীরকম জঙ্গিতৎপরতা চলছে তাই নিয়ে আলোচনা করতে চান। বাসুদেবের সবচেয়ে বড় সুবিধে হল ওর চেহারার মধ্যে একটু মঙ্গোলিয়ান ছাপ আছে। মোটাসোটা শরীরটা নিয়ে সে নিজেই এমন রসিকতা করতে পারে যে অপরিচিত মানুষ তার কথায় মজা পায়। তা ছাড়া সেই মেঘালয়, মণিপুর, অসমের মানুষের ভাষা সে স্বচ্ছন্দে বলতে পারে। নেপালিটাও। অতএব খবর জোগাড় করতে তার অসুবিধে হয় না। কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে হোটেলে আসামাত্র সে নীলার টেলিফোন পেল। বেশ উত্তেজিত হয়ে নীলা বলল, 'কোথায় ছিলে তুমি? সেই দুপুর থেকে তোমাকে খুঁজছি। দাদাকে ওরা নিয়ে গিয়েছে।'

'কারা?' বাসুদেব হতভম্ব।

'জানি না! জিপ থেকে নামিয়ে নিয়ে চলে গেছে।'

'ঠিক আছে, আমি আসছি।'

টেলিফোন নামিয়ে কিছুক্ষণ পাথরের মতো বসে রইল সে। সৌমিত্রর চিঠি পড়ে তো বটেই তার নিজেরও ধারণা হয়েছিল ডাক্তার বলে কেউ ওর ক্ষতি করতে চাইবে না। কিন্তু কারা নিয়ে গিয়েছে? ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট না অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স? যারাই কিডন্যাপ করুক তারা আজ না হয় কাল মুখ খুলবে। কিন্তু ততক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা যায় না। ওই রাত্রে কলকাতা থেকে আগরতলায় যাওয়া অসম্ভব।

কালকের ফ্লাইটে যে করেই হোক জায়গা পেতে হবে। এমনিতেই আগরতলায় যাওয়ার জন্যে জায়গা পাওয়া মুশকিল কিন্তু তাকে যেতেই হবে।

পুজো আসছে। সহকর্মী ডাক্তারকে একটা দিন চালিয়ে দিতে বলে সৌমিত্র বুরাখার বাজার থেকে ম্যাক্সি ট্যাক্সিতে উঠেছিল। ওই ম্যাক্সি ট্যাক্সি সোজা আগরতলায় যায়। আজ দুপুরের মধ্যে পৌঁছে বিকেলে স্ত্রীকে নিয়ে পুজোর কেনাকাটা করা যাবে। এটা নাকি সে সঙ্গে না থাকলে স্ত্রীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। গাড়িটা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। মোট বারোজন প্যাসেঞ্জার। বাঙালি একজনও নেই। সকাল আটটায় গাড়ি বুরাখা ছাড়িয়ে এগোতে লাগল। চারপাশের ঘরবাড়ি শেষ হয়ে গেলে মাঠ আর জঙ্গল। সৌমিত্র শুনল ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। সে জানলার পাশে বসেছিল। মুখ বাড়িয়ে তাকাতেই দেখতে পেল দুজন লোক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে প্যান্ট আর শার্ট, হাতে গামছায় জড়ানো রয়েছে কিছু। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিতেই ওরা পাশে এসে ড্রাইভারকে নামতে হুকুম করল। ততক্ষণে গামছার আড়াল কিছুটা সরে গেছে, এ কে ফিফটি সিক্স দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। অত্যাধুনিক এই আগ্নেয়াস্ত্রটি খুব হালকা এবং কার্যকরী ক্ষমতা অনেক বেশি।

ঠিক তখনই ওপাশ থেকে আরও দুটো লোক নিঃশব্দে চলে এল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ওরা কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে আদেশ দিল সবাইকে নেমে দাঁড়াতে। সুড়সুড় করে অন্য যাত্রীদের নামতে দেখে সৌমিত্র নামল। লাইন করে দাঁড় করিয়ে ভালভাবে দেখতেই ওরা তার সামনে এসে দাঁড়াল। একজন গম্ভীর গলায় বলল, 'ডাকদর, চলো।'

'কোথায় যাব?' সৌমিত্র ঘাবড়ে গেল।

'পেশেন্ট আছে, চলো।'

'না। আমি যাব না, পেশেন্ট থাকলে হাসপাতালে নিয়ে এসো, দেখে দেব।'

'আনা যাবে না।' লোকটা ওর হাত ধরে টানতেই সৌমিত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করল। ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় সে ঘুসি মারতেই বাকি দুজন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার দুটো হাত পেছনে মুড়ে বেঁধে ফেলল ওরা। তারপর দুই হাতের ফাঁকে লাঠি ঢুকিয়ে সেই লাঠির প্রান্ত দুজন দুদিকে ধরে বলল, 'চলো, ডাকদর।'

দৌড় শুরু হল। লোকদুটোর দৌড়ানোর সঙ্গে তাল না রাখতে পারলে দুই বগলে লাঠিটা তীব্র যন্ত্রণা ছড়াচ্ছে। অথচ দৌড়াবার অভ্যেস নেই সৌমিত্রর। কাতর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কে তোমরা?'

একজন শান্ত গলায় জবাব দিল, 'পেশেন্ট আছে।'

আশেপাশের কিছু মানুষ অলস চোখে তার এই যাওয়া দেখছে কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করছে না। রাস্তা ছেড়ে ওরা জলাজমির মধ্যে নেমে পড়েছে। সৌমিত্রর মনে হচ্ছিল তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। দৌড়াতে দৌড়াতে হৃৎপিণ্ড গলার কাছে উঠে এসেছে। গাছগাছালি তার নজরে পড়ছিল না। এবার ওরা উঠে এল পিচের রাস্তায়। রাস্তাটা ডিঙিয়ে ওপারে জঙ্গলে নামবে। এই রাস্তায় প্রায়ই বর্ডার সিকিউরিটির

সৈন্যরা টহল দেয়। সৌমিত্র কাটা কলাগাছের মতো রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ল। সে আর দৌড়াতে পারছে না বলে যতটা সময় নেওয়া যায় আর তার মধ্যে যদি টহলদাররা এসে পড়ে এই সুযোগ নিচ্ছিল। একজন আচমকা চড় মারল সৌমিত্রর মুখে। কলার ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'ডাকদর, মারাঠা আইস্যা পড়ব। গুলি ছুড়লে তুমিও বাঁচবা না। চলো।'

অতএব আবার দৌড় শুরু করতে হল। এ অঞ্চলের উপজাতি মানুষেরা ফোরটিন্থ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্টরিকে সংক্ষেপে মারাঠা বলেই ডাকে। এই বাহিনী পুলিশের মতো নিয়মকানুনের ধার ধারে না। তাই ওদের উপস্থিতিকে খুব ভয় পায় স্থানীয় মানুষ।

জুতোয় বালি ঢুকে গেছে। সেই বালিতে পা ছড়ে যাচ্ছে। জলে মোজা জুতো ভিজে গেছে। সৌমিত্র আর পারছিল না। মাঝে মাঝে কোনও গ্রামবাড়ির পাশে দাঁড়াচ্ছিল ওরা জল খেতে। বাড়ির ভেতর ঢুকে ওরাই জল নিয়ে আসছিল। বাড়ি বা গ্রামের কোনও মানুষ সৌমিত্রকে দেখতেও বেরিয়ে আসছিল না। পেট ভরে জল খেয়েও তৃষ্ণা যাচ্ছিল না সৌমিত্রর। সমস্ত শরীর ঘামে চপচপে। শরীর যখন আর পারছে না তখন ওরা দাঁড়াল। জঙ্গলের মধ্যেই বাড়ি। সেই বাড়ির পিছনে জঙ্গলের মধ্যেই চাটাই পেতে তাকে বসতে বলল ওরা। বসার বদলে শুয়ে পড়ল সৌমিত্র। পায়ের জুতো খোলার শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না শরীরে। পড়ামাত্র তার জ্ঞান লোপ পেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সে জানে না। যখন চোখ মেলল তখন মাথার ওপর চওড়া প্লাস্টিকের শিট টাঙানো, তার ওপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। দুজন লোক তার দু পাশে বসে হুঁকো খাচ্ছে। তাকে চোখ মেলতে দেখে লোকদুটো হাসল। উঠে বসে জুতো খুলল সে। দুটো পা বালিতে ছড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। এখন তার হাত বাঁধা নেই। এই লোকদুটোর একজনের হাতে এম সিক্সটিন রাইফেল। ত্রিপুরার পুলিশও এইসব অস্ত্র হাতে পায় না। এবার বাড়ি থেকে বাকি দুজন বেরিয়ে এল খাবার নিয়ে। ভাত আর মুরগির মাংস। বলল, 'ডাকদর, খাও।'

চুপচাপ খেয়ে নিল সৌমিত্র। খিদেও পেয়েছিল খুব। খাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কোথায় যাচ্ছি?'

'পেশেন্ট আছে।'

'সেই পেশেন্ট কোথায়?'

'আছে, আছে।' ধমকে উঠল একজন।

আবার শুরু হল দৌড়। মোজা খুলে শুধু জুতো পরেছিল সৌমিত্র। এবার আর পেছনে লাঠি নেই, দৌড়ানোটাও যেন প্রাণভয়ে নয়। মাঝে মাঝে বাড়ি দেখলেই থামছে ওরা। জল খেয়ে নিয়ে আবার চলা। সৌমিত্রর সামনে দুজন, পিছনে দুজন। পালিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। এক জীবনে এত দৌড়ায়নি সে। শেষপর্যন্ত তার হাল দেখে ওরা দৌড়ানো বন্ধ করল। ধুঁকতে ধুঁকতে ওরা সন্ধে নাগাদ যেখানে পৌঁছাল সেখানে একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। বাড়ির পিছনে জঙ্গলে প্লাস্টিকের

শিট পাতা হল। আবার শুয়ে পড়ল সে। যন্ত্রণায় শরীর কুঁকড়ে উঠছে, ঘুম এল না। বাড়ির ভেতর থেকে মশার ধূপ নিয়ে এসে জ্বালিয়ে দিল অনেকগুলো। দুজন সবসময় পাহারায় রয়েছে। ঘণ্টাখানেক বাদে চারজন নতুন লোক সেখানে পৌঁছে যেতেই যারা এতক্ষণ তাকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে তারা চুপচাপ বিদায় নিল।

নতুন চারজনের যে নেতা তার বয়স পঁচিশের বেশি নয়। ব্যায়াম করা চেহারা, লম্বা, কোনও মেদ নেই। সোজা সৌমিত্রের সামনে এসে বসল সে, 'গুড ইভনিং ডক্টর। কেমন আছেন?'

'মানে? আমি কেমন আছি? আপনি কি অন্ধ? দেখতে পাচ্ছেন না?' খেঁকিয়ে উঠল সৌমিত্র।

'আমি খুব দুঃখিত, বোধহয় আপনার কষ্ট হয়েছে। কিন্তু এভাবে ছাড়া আপনাকে নিয়ে আসা যেত না। আমরা ভদ্রভাবে ডাকলে আপনি আসতেন? বলুন?' ছেলেটি হাসল।

'আমাকে কেন এনেছেন?'

'দুটো কারণে। প্রথমটা তো আপনি জানেন, একজন পেশেন্টকে চিকিৎসা করতে হবে। দ্বিতীয়টা না হয় খাওয়াদাওয়ার পর বলা যাবে।' ছেলেটি একটা সিগারেট ধরাল।

'আপনি তো ভাল বাংলা বলেন!'

'কী আশ্চর্য? কেন বলব না? আমি স্কুল কলেজ সব আগরতলায় করেছি। প্রচুর বাঙালি বন্ধুবান্ধব ছিল আমার। দু-এক পিস কবিতাও বলতে পারি।' ছেলেটি হাসল।

সৌমিত্রর মনে হল এর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা যায়। সে বলল, 'দেখুন, পেশেন্ট দেখতে যেভাবে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে আমি নিজেই পেশেন্ট হয়ে যাচ্ছি।'

'আর হবে না ডক্টর। আমি এসে গেছি।'

এইসময় খাবার এল। হ্যারিকেন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল গাছের ডালে। রাজ্যের পোকা তার আলোকে ঢেকে ফেলছে। তবু তাতেই যেটুকু দেখা যায় তার মধ্যে খাওয়া শুরু হল। তেমন পরিবর্তন নেই, ভাত আর মুরগির মাংস। দুপুরের রান্না অনেক ভাল ছিল।

খাওয়া শেষ হলে ছেলেটি বলল, 'এবার আপনি ঘুমিয়ে নিন তবে তার আগে কয়েকটা লাইন লিখতে হবে আপনাকে।'

'কী লিখব?'

নেতার নির্দেশে একজন কাগজ কলম এনে দিল। নেতা বলল, 'আপনার বাবাকেই অ্যাড্রেস করুন। লিখুন, আমি ত্রিপুরার স্বাধীনতাকামী মানুষদের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বইচ্ছায় চলে এসেছি। এদের সাহায্য করার জন্যে আমি পঁচিশ লক্ষ টাকা দেব বলে কথা দিয়েছি। এই চিঠি পাওয়ার বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ওই টাকা নিয়ে আমাদের বাড়ির ড্রাইভারকে গাড়ি চালিয়ে মান্দারে আসতে হবে। কবে কখন আসবে সেটা এরা আপনার কাছ থেকে জেনে নেবে। পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। তাতে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য হব এবং বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। নাম সই করে

তারিখ লিখুন।'

লিখতে লিখতে থেমে গিয়েছিল সৌমিত্র, 'অসম্ভব।'

'অসম্ভব শব্দটা মূর্খদের অভিধানে থাকে বলে শুনেছি।' ছেলেটি বলল।

'আপনারা আমাকে কিডন্যাপ করেছেন পঁচিশ লাখ টাকার জন্যে?'

'হ্যাঁ। টাকাটার খুব প্রয়োজন।'

সৌমিত্রর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। সে কোনওমতে নিজেকে সামলাল, 'পঁচিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

'মিথ্যে কথা বলে কোনও লাভ হবে না ডক্টর। আপনার বাবা পুলিশের ডি আই জি ছিলেন। চাকরিজীবনে উনি কী পরিমাণ ঘুষ নিতে পারেন আমরা জানি। ত্রিপুরায় বাঙালি চাকরি করে মাইনের জন্যে নয়, উপরি রোজগার করতে। আর পুলিশের চেয়ে কে বেশি তার সুযোগ পায়? লিখুন।'

'না। আমার বাবা অন্যরকম মানুষ।'

'ঠিক আছে, আপনার বউ দেবে। তার বাবার কাছ থেকে এনে দেবে। তা হলেই আপনি ঠিক পুজোর আগে ওদের কাছে ফিরে যেতে পারবেন; খুব মজা করবেন।' ছেলেটি থামল।

এদের কাছে অনুরোধ বা কাকুতিমিনতি করে কোনও লাভ হবে না। সৌমিত্র অন্য পথ ধরল। সে হাসল, 'আপনি পাগল হয়ে গেছেন।'

'মানে?'

'পৃথিবীতে আজ যদি সবচেয়ে সুখী কোনও মানুষ থাকে সে হচ্ছে আমার স্ত্রী।'

'আপনার স্ত্রী?' ছেলেটি হকচকিয়ে গেল।

'কিডন্যাপের খবরটা পাওয়ামাত্র সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে লাফাবে। ভগবানকে ডাকবে যাতে আমি যেন কোনওদিন ফিরে না যেতে পারি। টাকা না দেওয়ার জন্যে যদি আমাকে মেরে ফেলা হয় তা হলে তার জন্যে ও পুজো দেবে। মরে গেলে আমার সমস্ত ইনস্যুরেন্সের টাকা, অফিস থেকে যা পাওয়ার সব হাতাবে। তারপর বিধবা হলেও আবার বিয়ে করতে তো আপত্তি নেই।'

সৌমিত্র অভিনয় করার চেষ্টা করল।

'বাজে কথা। একদম বাজে কথা!' ছেলেটি প্রতিবাদ করল।

সৌমিত্র লক্ষ করল তার কথাগুলো বাকি তিনজন মন দিয়ে শুনে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। সে বলল, 'একটু ভেবে দেখুন। আমি আগরতলায় ডাক্তারি করতাম। আমার বাবা ডি আই জি ছিলেন। আমি কেন বদলি হয়ে বুরাখাতে আসব? যে কোনও বাঙালি বুরাখা কিংবা মান্দারের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে। কিন্তু আমি এসেছি আর আমার স্ত্রী কোনও বাধা দিল না। কোনও স্ত্রী সেটা করবে? সে তো বলতেই পারত চাকরি ছেড়ে দিয়ে আগরতলায় তুমি প্র্যাকটিস করো। বলেনি। সে চাইছিল আমার কিছু একটা হয়ে যাক। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলে এইরকম হয় ভাই।'

ছেলেটি কয়েক সেকেন্ড ভাবল। তারপর বলল, 'লেখাটা শেষ করুন।'

'এর পরেও লিখতে বলছেন?'

'হ্যাঁ। আমার ওপর অর্ডার আছে আজই আপনার চিঠি পাঠাতে হবে। লিখুন।'

বয়ানটা ঘোরাবার চেষ্টা করল সৌমিত্র। কিন্তু ছেলেটি প্রচণ্ড ধমক দিল। অতএব ওর কথামতো লিখতে হল।

চিঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ছেলেটি, 'এখন আপনি ঘুমাতে পারেন। আমরা ঠিক রাত তিনটের সময় রওনা হব। আর একটা কথা, পালাবার চেষ্টা করবেন না। আমরা যেখানে আছি তার কুড়ি মাইলের মধ্যে কোনও বাঙালি নেই। অতএব ধরা আপনাকে পড়তেই হবে।'

'আমি নির্বোধ নই যে পালিয়ে বিপদ ডেকে আনব।'

'ধন্যবাদ।' ছেলেটি চলে গেল।

সৌমিত্র বাকি তিনজনকে দেখল। চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে প্রথমজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি বিয়ে করেছ?'

লোকটা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসল। সৌমিত্র বুঝল, এদের উপর নির্দেশ আছে তার সঙ্গে কথা না বলতে। অথবা ভাল বাংলায় এরা কথা বলতেই পারে না। পার্বত্য ত্রিপুরার উপজাতিরা এখন বাধ্য না হলে বাংলা বলে না। সে শুয়ে পড়ল। মাথার ওপর জঙ্গলের আড়ালের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ। সেখানে তারা জ্বলছে। সৌমিত্র ভেবে পাচ্ছিল না এই চিঠি বাড়িতে পৌঁছোলে সেখানে কী কাণ্ড ঘটবে!

আগরতলায় পৌঁছে সোজা শ্বশুরবাড়িতে চলে এল বাসুদেব। বাইরের ঘরে তখন বিধ্বস্ত পি বি তাঁর পরিচিত কয়েকজন পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে কথা বলছিলেন। জামাইকে দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন শ্বশুরমশাই। বললেন, 'আমার কথা তোমরা শুনলে না। শুনলে আজ এই অবস্থা হত না।'

'আপনি চাননি সৌমিত্র ওখানে যাক।' নিচু গলায় বলল বাসুদেব।

'হ্যাঁ, কেন চাইনি তা এখন বুঝতে পারছ তো?' তার চিঠি পড়ে তুমি বড় গলায় বললে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই, সৌমিত্র ভাল আছে। এখন কী বলবে তুমি?' পি বি-কে খুব হতাশ মনে হচ্ছিল।

'ওরা যে একজন ডাক্তারকে কিডন্যাপ করবে আমি ভাবতে পারিনি। এর আগে কোনও ডাক্তারের দিকে ওরা হাত বাড়ায়নি। কিন্তু কারা ওকে কিডন্যাপ করেছে তা কি জানতে পেরেছেন?'

মাথা নাড়লেন পি বি। এক পুলিশকর্তা বললেন, 'কেউ ক্লেমই করছে না। মুশকিল হয়েছে কিছু সমাজবিরোধী একটা টিম করে জঙ্গিদের কায়দায় কিডন্যাপ করে টাকা হাতাবার চেষ্টা করছে আজকাল। ওদের কেউ হলে কিছুই জানা যাবে না।'

বাসুদেব বলল, 'তা হলে আপনারা এখন কী ভাবছেন?'

পি বি বললেন, 'কিছুই ভাবতে পারছি না। বাবা হয়ে আমি কখনওই চাইব না আমার ছেলের মৃত্যু হোক। যেমন করে হোক ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।'

আর একজন পুলিশকর্তা বললেন, 'কাল রাত্রে আমরা সমস্ত বুরাখা চষে ফেলেছি কিন্তু সৌমিত্রকে পাওয়া দূরের কথা, কোনও সূত্র খুঁজে পাইনি। কেউ মুখ খুলতে

চায়নি। ঘটনাটা যে ঘটেছে তাই কেউ জানে না।'

বাসুদেব অন্দরমহলে চলে এল। শাশুড়ি তাঁর খাটে শুয়ে কেঁদে চলেছেন। সৌমিত্রর স্ত্রী মাথায় হাত দিয়ে তাঁর পায়ের পাশে বসে আছে। ওকে দেখে নীলা এগিয়ে এল, 'কী হবে?'

বাসুদেব কোনও উত্তর দিল না। তার উপস্থিতি টের পেয়ে শাশুড়ি সশব্দে কেঁদে উঠলেন, 'আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। আমি ওকে যেতে দিতে চাইনি, তোমরা কেউ ওকে বাধা দাওনি। আমার ছেলে যদি মরে যায়, ও ভগবান, আমার কী হবে!' গোঙানির স্বরে কান্না চলল।

নীলা গিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরল, 'মা শক্ত হও, ও এসে গিয়েছে, একটা কিছু ব্যবস্থা হবে।'

'বাসুদেব কী করবে? ও তো রিপোর্টার। তোর বাবাই কিছু করতে পারছে না। কোনও খবরই নিয়ে আসতে পারছে না। আমার সব শেষ হয়ে গেল—!' শাশুড়ি হাঁপাতে লাগলেন।

সৌমিত্রর স্ত্রী উঠে এল বাসুদেবের সামনে, 'আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।'

'কী করব!' অসহায় গলায় বলল বাসুদেব।

'আমি জানি না। ওর কিছু হলে আমি আত্মহত্যা করব!' শক্ত গলায় বলল মেয়েটি।

ঠিক তখনই বাইরের ঘর থেকে চিৎকার ভেসে এল। পি বি-র গলা। কাউকে ডাকছেন, কাকে ডাকছেন তা বোঝা যাচ্ছিল না। ওরা ছুটল, এমনকী শাশুড়িও।

পি বি দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একটা চিঠি। একজন পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু এটা যে আপনার ছেলের লেখা সে ব্যাপারে কি আপনি নিঃসন্দেহ?'

'ওয়েল, আমি তো অনেকদিন ওর হাতের লেখা দেখিনি।' পি বি মাথা নাড়লেন। তারপর ওদের দেখতে পেয়ে বললেন, 'গার্ডটা এমন ইডিয়ট যে এই অবস্থায় কে একজন স্কুটারে চড়ে গেটের কাছে এসে আমাকে একটা খাম পৌঁছে দিতে বলল আর সে তাকে ছেড়ে দিল। লোকটাকে ধরতে পারলে খোকাকে খুঁজে বের করতে সুবিধে হত।' পি বি আবার উত্তেজিত হলেন।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'কার চিঠি এসেছে?'

'খোকার।' বলেই পি বি সংশোধন করার চেষ্টা করলেন, 'যদিও আমি নিশ্চিত নই এটা ওর লেখা। বউমা, দেখো তো, এটা খোকার হাতের লেখা কিনা!'

সৌমিত্রর স্ত্রী চিঠিটা নিয়ে চোখের সামনে ধরল। লাইনগুলো পড়েই সে কেঁদে উঠল। সেই অবস্থায় মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। বাসুদেব বলল, 'সৌমিত্র কিছুদিন আগে আমাকে চিঠি লিখেছিল। ওর হাতের লেখা আমার মনে আছে, দেখি!'

সে হাত বাড়াতে সৌমিত্রর স্ত্রী চিঠিটা দিয়ে দিল। চিঠি পড়ে বাসুদেব মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, এটা সৌমিত্রর হাতের লেখা, কোনও সন্দেহ নেই।'

শাশুড়ি বাইরের লোকের উপস্থিতি উপেক্ষা করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আঃ, কী লিখেছে, আমাকে বলো!'

সৌমিত্রের চিঠি পড়ল বাসুদেব, 'শ্রীচরণেষু বাবা, আমি ত্রিপুরার স্বাধীনতাকামী

মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বইচ্ছায় চলে এসেছি। এদের সাহায্য করার জন্যে আমি পঁচিশ লক্ষ টাকা দেব বলে কথা দিয়েছি। এই চিঠি পাওয়ার বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ওই টাকা নিয়ে আমাদের বাড়ির ড্রাইভারকে গাড়ি চালিয়ে মান্দারে আসতে হবে। কবে কখন আসবে সেটা এরা আপনার কাছ থেকে ফোনে জেনে নেবে। পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। তাতে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য হব এবং বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। সৌমিত্র বসু, তারিখ...।'

এক পুলিশকর্তা বললেন, 'একটা প্ল্যান করা যাক। টাকার বদলে ছেঁড়া কাগজ স্যুটকেসে পুরে আপনার ড্রাইভার মান্দারে যাবে। ওরা নিশ্চয়ই ফোন করে জেনে নেবে কবে যাবে। সেইমতো আমরা সমস্ত মান্দার কভার করে রাখব। ওরা যেই ড্রাইভারের কাছে টাকা নিতে আসবে তখনই ওদের ধরে ফেলতে পারব। আর ধরা পড়ার পর আমাদের চাপে ওরা বলতে বাধ্য হবে সৌমিত্রবাবুকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। অনেক সহজ হয়ে গেল সমস্যাটা।'

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'অফিসার, আপনি অনেকদিন মান্দারে যাননি, না?'

'কেন? কেন?' ভদ্রলোক ভ্রূ কোঁচকালেন।

'আপনি যেই মান্দারের স্বাভাবিক পুলিশি ব্যবস্থার পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবেন তখনই ওরা বুঝে যাবে উদ্দেশ্য কী! কেউ আমাদের ড্রাইভারের সামনে আসবে না।'

'ওরা খবর পেয়ে যাবে বলছেন?'

'ওদের গোয়েন্দা দপ্তর আপনাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী।'

পি বি বললেন, 'কী করি! মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা। এর মধ্যে এত টাকা কী করে জোগাড় করি! সারাজীবন চাকরি করে আমি তো ওর অর্ধেক টাকাও জমাতে পারিনি।'

শাশুড়ি বললেন, 'তুমি আমার গয়নাগুলো নাও। কিছু তো পাওয়া যাবে। যে করেই হোক খোকাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

সৌমিত্রর স্ত্রী বলল, 'আমার গয়নাগুলো দিচ্ছি। ব্যাঙ্কে আমার নামে যে টাকা আছে—!'

বাসুদেব বাধা দিল, 'কী আশ্চর্য! আপনারা পঁচিশ লাখ টাকা দেবেন নাকি?'

'দিতে হবে। কিন্তু কীভাবে দেব জানি না।' পি বি বসে পড়লেন।

একজন অফিসার বললেন, 'কিন্তু স্যার, আপনি র‍্যানসম দিয়েছেন জানাজানি হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলবে।'

'আর আস্থা! আমরা সাধারণ মানুষকে কোনও প্রটেকশন দিতে পেরেছি? এই সেদিন একটা পানের দোকানের মালিককে ওরা তুলে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইল। ওর বউ মেয়ে এসে আমাদের কাছে কান্নাকাটি করল! কী করতে পেরেছি আমরা? শেষপর্যন্ত দোকান বাড়ি বিক্রি করে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল কটকে।' পি বি উত্তেজিত গলায় বললেন।

'কিন্তু স্যার, ওরা যা চাইছে তাই দিলে ওদের দাবি আরও বেড়ে যাবে।' আর একজন অফিসার বললেন।

'ওরা যা চাইছে তাই দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।' পি বি মাথায় হাত দিলেন।

অফিসাররা উঠলেন। যাওয়ার আগে অনুরোধ করে গেলেন এখনই কোনও সিদ্ধান্ত না নিতে। এখনও বাহাত্তর ঘণ্টা সময় আছে। ভেবেচিন্তে একটা পথ বের করতে হবে। পি বি তাঁদের মনে করিয়ে দিলেন যে তিনি তার ছেলের ব্যাপারে পুলিশের কাছে কোনও ডায়েরি করেননি। অতএব এই ব্যাপার নিয়ে পুলিশ যেন এখনই সক্রিয় না হয়। ওরা চলে গেলে নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু বাবা, পুলিশ কি কিছুই করতে পারবে না?'

প্রাক্তন ডি আই জি চোখ বন্ধ করলেন, 'সত্যি কথাটা আমাকে দিয়ে নাই বা বলালে মা।'

শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে টাকার কী ব্যবস্থা হবে?'

'জোগাড় করতে হবে। ওরা যদি ফোন করে তা হলে অনুরোধ জানাব পরিমাণটা কমাতে। শুনবে কি না তা জানি না। না হলে ধার করতে হবে। আমাদের নতুন বাড়িটা বন্ধক রেখে টাকা নেব।' পি বি বললেন।

শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, 'নীলা, তোরা কিছু দিতে পারবি না?'

নীলা বাসুদেবের দিকে তাকাল। বাসুদেব বলল, 'আমাদের পক্ষে যা সম্ভব তা নিশ্চয়ই দিতে পারি। কিন্তু আমার প্রশ্ন, টাকা পেয়ে ওরা সৌমিত্রকে ছাড়বে তার কী গ্যারান্টি আছে?'

'তার মানে?' সৌমিত্রর স্ত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'যারা আন্দোলনের নামে সাধারণ মানুষকে কিডন্যাপ করে টাকা রোজগার করছে তাদের কোনও আদর্শ আছে বলে আমি মনে করি না। ওরা মিথ্যাচার করতে পারে। এর আগেও তো এমন ঘটনা হয়েছে। টাকা পাঠানোর পরেও লোকটাকে পাওয়া যায়নি।' বাসুদেব বলল।

পি বি বললেন, 'সেই ভদ্রলোক আগে থেকেই অসুখে ভুগছিলেন। বন্দিদশায় সেটা বেড়ে যায়। ওষুধ পাওয়া যায়নি। ওরা মারেনি, বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন ভদ্রলোক।'

'হ্যাঁ, এটা ওদের বক্তব্য। টাকা পাওয়ার পরেও মৃতদেহের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা যারা চাইতে পারে তাদের আমি বিশ্বাস করি না।' বাসুদেব বলল।

'কিন্তু বিশ্বাস না করে কোনও উপায় তো নেই বাসুদেব।' পি বি বললেন।

'আমি টাকা দেওয়ার বিরোধী।' বাসুদেব বেশ জোরে বলল।

শাশুড়ি চিৎকার করলেন, 'কিন্তু টাকা না পেলে ওরা খোকাকে মেরে ফেলবে যে।'

'পেলেও তো মারতে পারে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন।

'তুমি কী করতে বলছ?' পি বি অসহায় গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমাকে সাতটা দিন সময় দিন।'

'সাতদিন? শুনলে ওরা বাহাত্তর ঘণ্টা মানে তিনটে দিনের মধ্যে টাকা চায়।'

'যারা টাকা চেয়েছে তারা জানে বলামাত্রই পঁচিশ লাখ টাকা পাওয়া যায় না। জোগাড় করতে সময় লাগে। ওরা ফোন করলে আপনি রাজি হবেন টাকা দিতে কিন্তু

জোগাড় করতে সময় লাগছে বলে যে কদিন পারেন ম্যানেজ করবেন।' বাসুদেব বলল।

'কিন্তু এই সাতদিনে তুমি কী করতে পার?' পি বি জিজ্ঞাসা করলেন।

'সেটা আমাকে ভাবতে দিন। আমি এখন যাচ্ছি, যা বললাম তা যদি না করেন তা হলে পরিণতির জন্যে আপনারাই দায়ী থাকবেন। নীলা, তোমার এখন এখানে থাকা উচিত। যাচ্ছি।' বাসুদেব বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

অরুন্ধতী নগর থেকে হরিগঙ্গা রোডে চলে আসার সময় বাসুদেব ভেবে পাচ্ছিল না ঠিক কী করা যায়! বাড়ি এসে সে অ্যানসারিং মেশিন এবং ই-মেইল চেক্ করল। কোনও খবর নেই। ঠিক কারা এই কাজ করেছে তা প্রথমে বের করা দরকার। পঁচিশ লাখ টাকা দিতে শ্বশুরবাড়ির সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। যারা অন্যায় করে, ভয় দেখিয়ে টাকা চায় তারা যদি টাকা না পায় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে যাকে কিডন্যাপ করে এনেছে তাকে খুন করতে পারে না। টাকা পাওয়ার আশায় পরিমাণটা কমিয়ে চাপ দেয়।

কিন্তু কারা করেছে কাজটা? বুরাখাতে গেলে খবরটা পাওয়া যাবে না। অথচ স্রেফ জেদের বশে সে সাতটা দিনের সময় চেয়েছে। কিছু একটা করতে হবে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে ওর চোখের সামনে সুরেন্দ্র দেবনাথের মুখ মনে পড়ল। সুরেন্দ্র একসময় তার সহপাঠী ছিল। কিন্তু সাফল্য পায়নি। বছর তিনেক আগে বাসুদেবের কাছে বলেছিল কোনও কাজের জন্যে। সেসময় মান্দাই-এ পুলিশ ক্যাম্পের জন্যে একটা ক্যানটিন খোলার পরিকল্পনা হয়েছিল। বাসুদেব সেটা জানত। ওপরের তলার কর্তাদেব অনুরোধ করে সুরেন্দ্রকে কাজটা পাইয়ে দিয়েছিল সে। সুরেন্দ্র দেবনাথ বেশ ভালভাবেই সেই ক্যানটিন চালাচ্ছে। সুরেন্দ্র কি খবর দিতে পারে? উপজাতি শ্রেণীর মানুষ হলেও সুরেন্দ্রর সঙ্গে যে কোনও জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ নেই সে ব্যাপারে বাসুদেব নিঃসন্দেহ। একসময় খেলাধুলো করত সে। ফুটবলটা ভালই খেলত। কিন্তু যত ভাল খেললে চাকরি পাওয়া যায় অথবা চাকরি পেতে হলে কর্তাদের যেসব হুকুম তামিল করতে হয় তা করেনি বলেই পার্টটাইম বা টেম্পোরারি চাকরির বেশি কিছু জোটেনি। খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর কোচদের সহকারী হিসেবে লেগেছিল এই আশায় যে ভবিষ্যতে কোচ হবে।

গ্যারেজ থেকে মারুতি বের করল বাসুদেব। মান্দাই যাচ্ছে বললে পরিচিত কেউ গাড়ি চালাতে চাইবে না। অথবা প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে। তার নিজের ড্রাইভার উপজাতি শ্রেণীভুক্ত হলেও এখন প্রায় বাঙালি হয়ে গিয়েছে। ও তো যেতেই চাইবে না, উলটে পাঁচজনকে বলে বেড়াতে পারে।

মান্দাই পৌঁছোতে একটু বেশি সময় লাগল। তখন বেলা তিনটে। কোনওদিকে না তাকিয়ে সে সোজা চলে গেল ব্যাটেলিয়ানের ক্যানটিনে। দুপুরের খাওয়া শেষ হওয়ায় তখন ক্যানটিনে ভিড় নেই। দু-তিনজন সেপাই বসে চা খাচ্ছিল। কাউন্টারের পেছনে বসে হিসেব করছিল সুরেন্দ্র, বাসুদেবকে দেখে অবাক। ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি? এখানে?'

'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

সুরেন্দ্র একবার চারপাশে তাকিয়ে নিল। পুলিশ বাদে তার যেসব কর্মচারী এখানে গজ করছে তারা সবাই উপজাতির। একজন বাঙালি গাড়ি চালিয়ে এসেছে, এমন টনা আজকাল মান্দাই-তে ঘটে না। সে হাঁক দিল চা বানাতে। তারপর বলল, বসো।'

বাসুদেব চেয়ার টেনে বসে বলল, 'এদিকের হাওয়া কেমন?'

'ভাল।'

'শোনো সুরেন্দ্র। আমি তোমার হেল্প চাই। গতকাল এখানকার ডাক্তারকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এই খবর তোমার জানা। কিন্তু তুমি বোধহয় জান না ওই ডাক্তার আমার নিজের শালা!' বাসুদেব বলল।

'জানি। লোকে বলত ডাক্তারবাবু ডি আই জি-র ছেলে। কিন্তু দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। আর ডি আই জি যে তোমার শ্বশুর এখবর তো জানাই ছিল।' সুরেন্দ্র বলল।

'ডাক্তারকে কারা ধরে নিয়ে গেছে?'

'বিশ্বাস করো, আমি জানি না। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমি এই চেয়ারে বসেছিলাম। বুরাখার রাস্তা থেকে ওকে তুলেছে ওরা। হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে কিন্তু কেউ বলছে না কারা নিয়ে গিয়েছে।'

'খবরটা জোগাড় করতে তোমার কতটা সময় লাগবে? বারো ঘণ্টা?'

'চেষ্টা করতে পারি। তুমি তো জানো খবর নিতে চাইছি জানাজানি হলেই আমার মৃত্যু অনিবার্য। তবু, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, আমি চেষ্টা করছি।'

চা এল। সঙ্গে বিস্কুট। সুরেন্দ্র নিচু গলায় বলল, 'তোমার এভাবে মান্দাইতে আসা ঠিক হয়নি। আমাকে আগরতলায় ডেকে পাঠাতে পারতে।'

'সময় নষ্ট হত।' চায়ে দুই চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আমার মোবাইল নম্বরটা জান? গুড।'

বেরিয়ে এল বাসুদেব। গাড়ি চালু করে মান্দাই বাজারের পাশ দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় তার মনে হল, এই জায়গাটার নাম ভারতবর্ষ। অথচ ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস কোনও বাঙালির নেই।

ফিরে আসার পথে কোনও বাধা এল না। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল, এখান থেকে মাইলখানেক ভেতরে গেলেই নোয়াসদের গ্রাম। এই নোয়াস লোকটা খ্রিস্টান। উপজাতি হলেও পড়াশুনায় ভাল বলে শেষপর্যন্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিল। সরকারি চাকরি পেয়েছিল সহজেই। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যেই ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই ব্যবসায় নামে। কিন্তু ব্যবসাও ঠিকমতো হচ্ছিল না। এইসময় এক বন্ধুর মারফত ওর সঙ্গে আলাপ হয় বাসুদেবের। বাসুদেব তাকে দুটো বড় কন্ট্রাক্ট পেতে সাহায্য করেছিল। লোকটা যে অকৃতজ্ঞ নয় তা বারংবার বোঝাতে চেষ্টা করেছে কিন্তু বাসুদেব তাকে নিরাশ করেছে। আজ বাসুদেব গাড়ি ঘোরাল। কনস্ট্রাকশনের কাজ যে করে সে যে বাড়িতে থাকবে এমন ভাবা ঠিক নয়, তবু যদি দেখা পাওয়া যায়!

দুপাশে চাষের জমি, গাছগাছালি পেরিয়ে যখন বাসুদেব নোয়াসের বাড়িতে পৌঁছাল তখন সন্ধে। প্রথমবার আসায় অন্তত তিনটি মানুষকে জিজ্ঞাসা করে হদিশ

জানতে হয়েছে। তিনজনেই তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছে। এই অঞ্চলে এসময়ে বাঙালি ঢোকে না। আদিবাসী বা উপজাতি মানেই কোনও জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হয়। জঙ্গিদের কাজকর্ম সমর্থন করে না এমন লোক প্রচুর আছে। যেমন নোয়াস। কিন্তু নোয়াসের একটা ব্যাপার এখনও তার কাছে স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয় যে কাজটা সে পাইয়ে দিয়েছিল সেটা বেশ বড় ধরনের। প্রচুর টাকার মূলধন দরকার। বন্ধু বলেছিল, ছেলেটা খুব পরিশ্রমী, উদ্যোগী কিন্তু ওর মূলধন কম। সেটা শুনে ইতস্তত করছিল বাসুদেব কিন্তু নোয়াস বলেছিল, 'টাকার জন্য চিন্তা নাই। সুদ দিলেই পাওয়া যায়।' বাসুদেব বলেছিল, 'কুড়ি লাখ টাকা ধার দেওয়ার লোক এখানে আছে?'

'কুড়ি? কয় কুড়ি চান!' হেসেছিল নোয়াস।

নোয়াসের বাড়িটা কিন্তু একতলা, মোটামুটি। ওর বাবা জানাল নোয়াস আগরতলায় গিয়েছে কিন্তু সন্ধের মধ্যেই ফিরবে। বাসুদেব পরিচয় দিতেই ভদ্রলোক চিনতে পারলেন, 'আপনার কথা খুব শুনছি। ওরে তো আপনিই হেল্প করেছেন। আপনাকে খুব মানে সে। বসেন, বসেন।'

বাসুদেব বলল, 'ওর তো ফিরতে অনেক রাত হতে পারে কিন্তু বুঝতেই পারছেন আমার পক্ষে রাত করা সম্ভব নয়।'

'তাইলে রাত্রে আর যাওনের দরকার কী! এখানেই থাকেন।'

বাসুদেব হাসল, 'তা হয় না। বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে।'

'কিছু বলার আছে ওরে?'

'না থাক। ও হ্যাঁ, নোয়াস নিশ্চয় ওর সেকেন্ড কাজটা শেষ করে ফেলেছে?'

বৃদ্ধ হাসলেন, 'হ্যাঁ। টাকাও শোধ করছে, সুদ সমেত।'

'তাই? এত টাকা কে দিল?'

'কে আর দিবে? আট-দশজন মানুষের হাতে তো এখন কোটি কোটি টাকা। তারাই টাকা খাটায়। টাকায় টাকা বাড়ে তাদের। বুঝতেই পারতেছেন।'

খুব সাহস করে নামটা উচ্চারণ করল বাসুদেব, 'টাইগার?'

'না না, ওদের কাছে কেন যাব? না না।' বৃদ্ধ আর ভাঙল না। ঠিক তখনই জিপের হেডলাইট দেখা গেল। জিপ থামলে এগিয়ে এল নোয়াস, 'আপনি? কী ব্যাপার?'

'এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।'

নোয়াস কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'খবরটা শুনলাম।'

'কারা কিডন্যাপ করেছে জান?'

'না। তবে ন্যাশনাল লিবারেশনের কেউ করেনি সে ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারি।'

'তা হলে টাইগার?'

'হতে পারে। আবার দু'নম্বরি জঙ্গিদের সংখ্যা তো রোজ বাড়ছে। তারাও হতে পারে।'

'খবরটা আমার দরকার নোয়াস!'

'ঠিক আছে। আজ রাত্রের মধ্যে পাবেন। কিন্তু আপনার তো একা আগরতলায় যাওয়া উচিত হবে না। রাত্রে এখানে থেকে যান।' নোয়াস বলল।

'নো। সেটা সম্ভব নয়।'

নোয়াস তাকে অপেক্ষা করতে বলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বৃদ্ধ চুপচাপ শুনছিলেন। এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারে নিছে?'

'আমার শালাকে।'

'কত টাকা?'

'পঁচিশ লাখ।'

'হইছে। লোভ বাড়তেছে প্রতিদিন। আহা, কত বয়স?'

'তিরিশ।'

'আহা। বিয়াসাদি ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আহা।' যেন কোনও মৃত মানুষের জন্যে শোক করছেন বৃদ্ধ। নোয়াস ফিরে এল, 'দাদা, আমার গাড়ি আপনাকে এসকর্ট করবে। চারজন থাকছে গাড়িতে। পুলিশ ঝামেলা করলে সামলে দেবেন।'

'ধন্যবাদ। তোমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করব।'

সামনের গাড়িটিকে অনুসরণ করছিল বাসুদেব। শহরের মুখে পৌঁছে নোয়াসের গাড়ি ফিরে গেল। ফলে কোনও ঘটনা ঘটেনি। জঙ্গিরা দূরের কথা পুলিশ পর্যন্ত তাদের চ্যালেঞ্জ করেনি।

বাড়ি ফিরে অ্যানসারিং মেশিনে নীলার গলা পেল সে। অনেকবার ফোন করেছে, না পাওয়ায় সবাই উদ্‌বিগ্ন। বাসুদেব শ্বশুরবাড়িতে ফোন করল, 'একটু কাজে বেরিয়েছিলাম। তোমাদের ওখানে নতুন কোনও খবর আছে?'

নীলা বলল, 'না। শোনো তুমি যেখানেই যাবে অন্তত চারঘণ্টা বাদে বাদে আমাকে ফোন করবে। দুই সেকেন্ডের জন্যে হলেও করবে। আমার খুব ভয় করছিল।'

বাসুদেব হাসল, 'ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছুই নয়।'

'শোনো, আমাদের উচিত বাবাকে সাহায্য করা। অবশ্য আমি তোমাকে জোর করতে পারি না। এটা আমার বাপের বাড়ির ব্যাপার। কিন্তু বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের সময় আমাকে যা দিয়েছিল তা যদি ফিরিয়ে দিই তা হলে তুমি কি রাগ করবে?'

'এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় এখনও আসেনি নীলা। আমার মোবাইল বাজছে, রাখছি।'

রিসিভার রেখে দিয়ে মোবাইল অন করল বাসুদেব। দুবার অদ্ভুত ধরনের যান্ত্রিক শব্দ বাজার পর তপন রিয়াং-এর গলা শোনা গেল, 'রিপোর্টার!'

'বলছি।'

'তোমাদের বক্তব্য রেডিয়োতে শুনলাম! এখন বলো তো, সাহেবদের ধারণা না তুমি তাদের বুঝাইছ কাশ্মিরীদের প্রব্লেম আমাদের থেকে অনেক বেশি? কও তুমি!'

'আমি কিছু বুঝাইনি। তোমাদের সমস্যা তোমাদের মতো, কাশ্মিরীদের সমস্যা তাদের মতো। আমি সারাদিন ছিলাম না, রেডিয়ো শুনিনি, টিভি দেখিনি, আমি চেক করছি।'

'হ, করো। রিপোর্টার, সাহেবদের বুঝাও।'
'কিন্তু তপন, এটা কি ঠিক করলে?'
'কী রিপোর্টার?'
'তোমরা আমার শালাকে তুলে নিয়ে গেলে?'
'তোমার শালা?'
'হ্যাঁ, বুরাখার ডাক্তার।'
'এ কী কথা। আমি তো প্রথমবার শুনতেছি। না না, তুমি ভুল শুনছ, আমাদের কেউ এসব করে নাই। আজকাল তো আদর্শ কেউ মানে না। পাঁচজন এক হইলেই কিডন্যাপ করে। তবু, আমি দেখতেছি, তোমার শালা যখন তখন দেইখতে লাগব।' লাইনটা কেটে দিল।

তপন রিয়াং টাইগার গ্রুপের জনসংযোগের দায়িত্বে। তার সবসময় বাসনা বাসুদেব সারা পৃথিবীতে তাদের খবর প্রচার করুক। লোকটা ফোন করে মোবাইলে। ক্যাশ কার্ড কিনে মোবাইলে কথা বললে যে নাম্বার পাওয়া যায় তাকে ধরা অসম্ভব। যে কেউ যে কোনও নামে ক্যাশ কার্ড কিনতে পারে। এবং কখনওই একই ক্যাশ কার্ড থেকে সে ফোন করে না। সম্ভবত যে ক্যাশ কার্ড শেষ হয়ে এসেছে সেটি ব্যবহার করে। কথা বলার পর ফেলে দেয়।

তপন রিয়াংকে টাইগারের নাম বাসুদেব বলেছিল অন্ধকারে ঢিল ছুড়তে। যদি লেগে যায়। লোকটা এত ধূর্ত যে ঠিক পাশ কাটিয়ে গেল।

রাত দশটার পর দুটো ফোন এল। প্রথমটা সুরেন্দ্র দেবনাথের। বলল, 'দাদা, খবর পেয়েছি। ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে চারজন আর্মড লোক নিয়ে গিয়েছে জীবন সর্দার পাড়া, রতনপুরের দিকে। লোকগুলো কোন দলের বোঝা যাচ্ছে না।' বাসুদেব ধন্যবাদ দিল। জীবন সর্দার পাড়া, রতনপুর মানে ওরা বাংলাদেশ বর্ডারের দিকে এগিয়েছে। বর্ডার পার হবে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় ফোনটা নোয়াসের। সে বলল, 'দাদা, আমি ঠিক বলেছিলাম। কাজটা ন্যাশন্যাল পার্টির নয়। চারজন লোক ডাক্তারকে নামিয়েছে। কোথায় নিয়ে গিয়েছে কেউ জানে না।'
'আমি খবর পেয়েছি ওকে জীবন সর্দার পাড়া—রতনপুরের দিকে নিয়ে গেছে।'
'তা হলে তো প্রব্লেম সলভ্ড।'
'তার মানে?'
'ওইসব এলাকা টাইগারদের দখলে। ওখানকার নেতার নাম জেস্টার।'
'তুমি নিঃসন্দেহ?'
'ওই এলাকায় ন্যাশন্যাল পার্টির কোনও বেস নেই। টাইগাররাই অপারেট করে।'
'থ্যাঙ্ক ইউ।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে ভাবতে শুরু করল বাসুদেব। পুলিশ এবং বি এস এফ-এর সাহায্য নিয়ে এখনই ওই সীমান্তে তল্লাসি চালানো যায়। কিন্তু তাতে পাওয়ার সম্ভাবনা আরও কমে যাবে। ওদের কাছে ঠিক খবর পৌঁছে যাবে।

পঁচিশ লাখ টাকা না পেলে ওরা কি সৌমিত্রকে মেরে ফেলবে? বাসুদেব বিশ্বাস করছিল না। ওরা নিশ্চয়ই টাকার অঙ্ক কমাবে। অপেক্ষা করবে। একটা অপারেশন

বৃথাই যাবে এটা নিশ্চয়ই ওরা চাইবে না। অতএব সময় পাওয়া যাবে। প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যখন জানা গেল কোন দল কিডন্যাপ করেছে, কোন দিকে নিয়ে গেছে তখন শুরুটা নিশ্চয়ই মন্দ হয়নি।

ট্রাইবাল ন্যাশন্যাল ভলেন্টিয়ারের নেতা বিজয় রামখেল রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। ত্রিপুরার মানুষের অধিকার আদায় করতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের চেষ্টা করেছিলেন ভদ্রলোক। সংঘাত বেধেছিল, দাঙ্গাও হয়েছিল কিন্তু ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শেষপর্যন্ত তাদের পৃথক জেলা পরিষদ গঠন করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এটাই তখন অনেকখানি মনে হলেও পরবর্তী পর্যায়ে নতুন দল ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা ঘোষণা করল শিশুর হাতে মোয়া ধরিয়ে দেওয়া তারা মানবে না। তাদের স্লোগান হল বাঙালি খেদাও, স্বাধীন ত্রিপুরা চাই। লক্ষ করা গেল এই দলের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রসাদ জামাতিয়া এবং নয়নবাসি জামাতিয়া ছাড়া সবাই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। ব্যাপটিস্ট চার্চের সঙ্গে তাদের সংযোগ আছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রিটিশদের প্রশ্রয়ে আসা খ্রিস্টান মিশনারিরা যে ধর্মপ্রচারে নেমেছিল তাদের কাজের জায়গা প্রশস্ত ছিল আদিবাসী অঞ্চল এবং পাহাড়ের মানুষদের মধ্যে। ত্রিপুরার আদিবাসীরা মূলত হিন্দু এবং দরিদ্র। এদের সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করতে যেটুকু অসুবিধে হচ্ছিল বাঙালি খেদাও আন্দোলন সেটা কিঞ্চিৎ দূর করল। বাঙালিরা হিন্দু। সুবিধেভোগী জাত। তারা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে তোমাদের বুকের ওপর চেপে বসেছে। তোমাদের নিজের জায়গায় প্রায় পরবাসী হয়ে আছ এখন। এদের হঠাতে গেলে এদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। হিন্দু হয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। তোমরা খ্রিস্টান হও, নিজের মাটি নিজে ভোগ করো। কিছুটা সাড়া পাওয়া যে যায়নি তা নয় কিন্তু সব মানুষ চট করে ধর্ম ছাড়তে পারছিল না। অভ্যেস অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এন এল এফের নেতারা যখন আত্মগোপন করলেন তখন তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন। বিশ্বমোহন দেববর্মা হলেন ডি বাইশন, যোগেন্দ্র দেববর্মা হলেন যোশুয়া, এমনকী বিষ্ণুপ্রসাদ জামাতিয়া যিনি খৃষ্টান ছিলেন না, দলের অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তিনিও নিজেকে জে বসং বলে ঘোষণা করলেন। খ্রিস্টানদের এই প্রাবল্য এবং চার্চের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে বৈষ্ণব নয়নবাসি জামাতিয়া দল ছেড়ে বেরিয়ে যান। ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট প্রকাশ্যে স্বীকার করছে না কিন্তু ত্রিপুরায় খ্রিস্টধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেলে হিন্দু বাঙালিরা বিপন্ন বোধ করবে বলে তাদের যে ধারণা একথা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। এই ফ্রন্ট এখন অত্যন্ত সুগঠিত কারণ দলের প্রথম সারির নেতাদের ধনভাণ্ডার প্রতিদিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। তাই হিন্দু হয়েও জে বসং এই দলের অন্যতম নেতা হয়ে থেকে গেছেন।

যেটা পারেননি নয়নবাসি। পালটা দল হিসেবে যখন অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স তৈরি হল তখন দেখা গেল এর নেতারা মূলত বৈষ্ণব। এঁদের ধর্মবিশ্বাস এত প্রবল যে মদ্যপান করাও অন্যায় ভাবেন। অথচ জামাতিয়া পদবির মানুষ এককালে ছিলেন রাজার সৈনিক। আর দেববর্মা পদবির মানুষের শরীরে রাজরক্ত রয়েছে। বিশ্বজিত

দেববর্মা দলের সম্পাদক, কৃষ্ণকমল দেববর্মা অন্যতম নেতা। হিন্দুধর্মী এই দলটির বিভিন্ন নেতার নামেই সেটা প্রমাণিত হয়। যেমন, ক্ষেত্রজয়, কল্পজয়, বিজয়। এঁদের সঙ্গে আছেন রিয়াং পদবির নেতারা যাঁরা আদিম উপজাতি গোষ্ঠী থেকে এসেছেন। টাইগার ফোর্সেরও একই দাবি, স্বাধীন ত্রিপুরা চাই, বাঙালিদের খেদিয়ে দাও।

আর এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে ত্রিপুরায় 'আমরা বাঙালি' দলটি একসময় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক আদর্শ নয়, শুধু বাঙালি আবেগ সম্বল করে এঁরা ত্রিপুরার দ্বিতীয় শক্তিশালী দল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কংগ্রেসের পতনের পর সি পি এমের ক্ষমতা দখল করার পাশাপাশি 'আমরা বাঙালি' অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিল কিছুকাল। কিন্তু বাঙালির আবেগ সবসময় বুদবুদের মতো। যত তাড়াতাড়ি তা জেগে ওঠে ঠিক তত তাড়াতাড়ি মিলিয়েও যায়।

ত্রিপুরায় সি পি এম একটি অদ্ভুত চরিত্র নিয়ে ছড়িয়ে আছে। গ্রামগুলোতে বিশেষ করে পার্বত্য ত্রিপুরার গ্রাম পঞ্চায়েত সি পি এমের দখলে। কিন্তু সেইসব পঞ্চায়েত নেতা পলিটব্যুরোর খবর দূরের কথা মার্কসের নাম জানেন না। আগরতলার নেতাদের নির্দেশ মান্য করতেই হবে এমন কোনও মানসিকতা তাঁদের নেই। এবং এই কারণেই টাইগার অথবা এন এল এফের অবাধ বিচরণ পার্বত্য এলাকায় সম্ভব হয়। অনেকটা, তোমরা তোমাদের মতো থাকো আমরা আমাদের মতো লুটেপুটে খাই, এইরকম ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

বাসুদেব স্থির করল, যে করেই হোক টাইগারের সম্পাদক বিশ্বজিত দেববর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এই একটি লোক পারে সৌমিত্রকে মুক্তি দিতে। কিন্তু তার গোপন আস্তানার খবর ত্রিপুরার পুলিশের জানা নেই। পাহাড়ের কোন খাঁজ, জঙ্গলের কোন গভীরে থেকে সে দলকে চালাচ্ছে তা সরকারি গোয়েন্দারা আন্দাজ করতেও পারে না। অবশ্য এখন দল চালানো মানে কিডন্যাপ করে টাকা রোজগার করা। এর চেয়ে সহজ উপায় তো আর কিছু নেই। আলফা অথবা বোরোদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে টাকা লাগবে। টাকা লাগে বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসতে।

টেলিফোন বাজল। এটা যদি তপন রিয়াং হয় তা হলে ওকেই বলবে বিশ্বজিত দেববর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। ওদের অনেক খবর সারা পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছে সে, তার বদলে এই দাবিটুকু মানতে হবে। রিসিভার তুলল সে, 'হ্যালো!'

পুলিশের এক বড়কর্তা শংকর দত্ত। শংকরবাবু বললেন, 'খবরটা শুনেছেন?'

'কোন খবর?'

'কী মশাই? এখনও শোনেননি। আমরা তো এখনই রায়াবাড়ি রওনা হচ্ছি।'

'রায়াবাড়ি? কেন?'

'সেখানে আজ বিকেলে গণধর্ষণ হয়েছে। করেছে এন এল এফের লোকেরা।'

'সে কী? কতজন ছিল ওরা?' বাসুদেব সোজা হয়ে বসল।

'এখনও খবর পাইনি। তবে এগারোজন মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

'আপনারা এই রাতে যাবেন?'
'হ্যাঁ, সি এম অর্ডার দিয়েছেন।'
'আমি সঙ্গে যেতে পারি?'
'আধঘণ্টার মধ্যে চলে আসুন।'

টেলিফোন ছেড়ে কম্প্যুটারের সামনে বসল বাসুদেব। 'ত্রিপুরার সীমান্তগ্রাম রায়াবাড়িতে গণধর্ষণ। এগারোজন মহিলাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের আঙুল এন এল এফের দিকে। ঘটনাস্থল থেকে ঘুরে এসে বিস্তারিত খবর পাঠাচ্ছি।' খবরটা টাইপ করে ই-মেইলে ওর বিদেশের টি ভি-বেতার কোম্পানির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নীলাকে ফোন করল সে। নীলাই ফোন ধরল, 'শোনো বাড়ির খবর কী?'

'মা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কাঁদতে কাঁদতে। ডাক্তার এসেছিল।'

'ওদের কোনও ফোন এসেছে?'

'না।'

'আমি খবর পেয়েছি টাইগাররাই কাজটা করেছে। কিন্তু বাড়ির কাউকে খবরটা এখনই বলার দরকার নেই। আর আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।'

'কোথায়? এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?' প্রায় চিৎকার করে উঠল নীলা।

'ভয়ের কিছু নেই। পুলিশের একটা বিশাল বাহিনী যাচ্ছে রায়াবাড়িতে। ওখানে গণধর্ষণ হয়েছে, খবর আনতে যাচ্ছি। কোনও দরকার পড়লে মোবাইলে ফোন করবে।' রেখে দিল বাসুদেব।

গ্রামটাকে ঘিরে ফেলেছিল পুলিশ। রাত তখন দুটো। অফিসারদের সঙ্গে জিপ থেকে নেমে গ্রামে ঢুকল বাসুদেব। শ'দেড়েক মানুষ ওই গ্রামে বাস করে। তারা এখন যে যার ঘরে। কয়েকজন মাতব্বর হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি থানা প্রায় তিরিশ মাইল তফাতে। তার দারোগা বড়কর্তাদের স্যালুট দিলেন। প্রধান কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় ঘটনাটা ঘটেছিল।'

দারোগা একজন মাতব্বরকে ডাকলেন, 'অ্যাই, এদিকে আয়। বল কোথায় হয়েছিল।'

সামনের ফাঁকা জমিটাকে দেখিয়ে দিল লোকটা। বড়কর্তাদের আসবার আগাম খবর পেয়েই সম্ভবত মশাল এবং হ্যাজাক জ্বালিয়ে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন দারোগা।

'কী হয়েছিল খুলে বলুন।'

লোকটি যে বাংলা বলল তা শ্রীহট্ট জেলার ভাষা। প্রথমেই সে জানাল, তাদের গ্রামের মানুষ কোনও রাজনীতিতে থাকে না। বাস্তুচ্যুত হয়ে এখানে এসে বেঁচে থাকার জন্যে পরিশ্রম করতেই দিন চলে যায়। আজ বিকেল চারটে নাগাদ হঠাৎই কুড়িজন লোক গ্রামে ঢোকে। ওদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল বা বন্দুক ছিল। ওরা আমাদের কাছে সাহায্য চায়। বলে বি এস এফের লোকজন খুব ঝামেলা করছে। তার ফলে ওরা বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশে যেতে সমস্যায় পড়েছে। আমরা যদি ওদের

হয়ে বাংলাদেশে যাওয়া আসা করি তা হলে বি এস এফ তেমন কিছু বলবে না। ওদের জন্যে মালপত্র এনে দিতে হবে এবং পৌঁছোতে হবে। তার জন্যে ওরা আমাদের টাকা দেবে। কিন্তু আমরা রাজি হলাম না। বললাম, ইন্ডিয়া সরকার আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। আমরা এমন কোনও কাজ করতে পারি না যাকে বেইমানি বলে। বেইমানি করলে ইন্ডিয়া সরকার আমাদের ক্ষমা করবে না। ওরা এসব কথা শুনতে চাইছিল না। খুব রেগে গেল, আমাদের শাসাতে লাগল। বলল, কথা না শুনলে গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে। ওই ওকে রাইফেল দিয়ে মেরে শুইয়ে দিল। যে লোকটাকে দেখানো হল তার মুখচোখ বেশ ফুলে গেছে। লোকটি বলতে লাগল, ওকে মারছে দেখে ওর মেয়ে ছুটে এসেছিল বাবাকে বাঁচাতে। তাকে ধরে ফেলে উলঙ্গ করল ওরা। তারপর গ্রামের সব লোককে লাইন দিয়ে দাঁড় করাল। ভয় দেখাবার জন্যে শূন্যে গুলি ছুড়ল একবার। আমাদের মেয়েদের মধ্যে থেকে দশজনকে বেছে নিয়ে মারধর করে ওই মেয়েটার পাশে উলঙ্গ করে দাঁড় করাল। তারপর একের পর এক ওরা ইজ্জত নষ্ট করল। আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে থাকল বাকিরা।

প্রধান কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েরা বাধা দেয়নি?'

লোকটি জানাল মেয়েরা বাধা দিতেই ওরা আরও নিষ্ঠুর হয়ে গেল। মেয়েরা যাতে কষ্ট পায় তাই উপুড় করে ধর্ষণ করল ওরা। এক একজন মেয়েকে তিন-চারজন। তারপর চলে যাওয়ার আগে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মেয়েগুলোর পিঠে ছুরি দিয়ে কাটাকুটি করে রক্ত বের করে ঘোষণা করল, 'আজ থেকে এদের আর কোনও ভয় নেই, এরা খ্রিস্টান হয়ে গেল।'

শংকর দত্ত চাপা গলায় বললেন, 'মাই গড।'

বাসুদেব এর আগে ধর্ষণের কেস দেখেছে। কিন্তু পিঠে ছুরি দিয়ে কাটাকুটির কথা শোনেনি। এখন এখানে এমন পরিস্থিতি যে এ ব্যাপারে বিশদে প্রশ্ন করতেও খারাপ লাগছে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই হাসপাতালে গেলে জানা যাবে। সে শংকর দত্তকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা হাসপাতালে যাবেন না?'

'এত রাত্রে গিয়ে তো কথা বলা যাবে না। আক্রান্তরা নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছে।' শংকর দত্ত বললেন।

'কিন্তু মানবিকতার কারণে আপনাদের যাওয়া উচিত। অন্তত ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে ওদের অবস্থা জেনে নিতে পারবেন।' বাসুদেব পরামর্শ দিল।

শংকর দত্ত তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন। ঠিক হল অর্ধেক দল আগরতলায় ফিরে যাবে, শংকর দত্ত এবং কয়েকজন হাসপাতালে যাবেন ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে। প্রধান কর্তা এরপরে গ্রামের মানুষদের কিছু প্রশ্ন করলেন। আক্রমণকারীদের কাউকে তারা চিনতে পেরেছে কি না? তারা কী ভাষায় কথা বলছিল? উত্তর হল, ওদের কেউ কখনও দেখেনি। আর কথা বলছিল আদিবাসীদের ভাষায়। যে ভাষায় পার্বত্য উপজাতিরা কথা বলে। কিন্তু তার সঙ্গে বাংলা শব্দও ব্যবহার করছিল।

ওই গ্রামে একটা পুলিশ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে প্রধান কর্তাদের কয়েকজন ফিরে গেলেন আগরতলায়। এখনই সি এমকে রিপোর্ট দিতে হবে। বাসুদেব হাসল। সি এম

ঘুম থেকে উঠে সকাল আটটায় হয়তো রিপোর্টটা দেখবেন। তারপর রিপোর্টার ডেকে জোরালো বিবৃতি দেবেন। বিধানসভা খোলা থাকলে জ্বালাময়ী ভাষণ দেবেন। প্রতিশ্রুতি দেবেন এই জঙ্গি বর্বরতা আর বরদাস্ত করবেন না। কিন্তু কাজের কাজ এক বিন্দুও হবে না।

হাসপাতালে পৌঁছোতে ভোর চারটে বাজল। বাইরে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। ডিউটিতে থাকা ডাক্তার শংকর দত্তকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শংকর দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েরা কেমন আছে?'

ডাক্তার বললেন, 'দুজনের অবস্থা বেশ খারাপ। ভেতরে হেমারেজ হয়েছে। বাকিরাও দিন পাঁচেকের মধ্যে হাঁটাচলা করতে পারবে না।'

'ঘুমাচ্ছে?'

'ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে বলে ঘুমাচ্ছে। তবে শরীরের থেকে আসল সমস্যা হল মনের। প্রত্যেকেরই নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়েছে।' ডাক্তার বললেন।

বাসুদেব চুপচাপ শুনছিল। এবার প্রশ্ন করল, 'ডাক্তার, ওদের গ্রামে গিয়ে শুনেছি, যে রেপ করার পর নাকি প্রত্যেকের পিঠে ছুরি দিয়ে কিছু করা হয়েছে। এটা কি সত্যি?'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, কারও কারও পিঠে ডিপ ক্ষত হয়েছে।'

'কী লিখেছে ওরা?'

'আসুন, দেখবেন। আমি কথাটা বলতে চাই না।'

ডাক্তারকে অনুসরণ করে ওরা ওয়ার্ডে এল। বেডের অভাবে একটিতেই দুজনকে রাখা হয়েছে। প্রত্যেকের শরীর গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। কেউ জেগে নেই। নার্স উঠে দাঁড়াতে ডাক্তার বললেন, 'একজনের পিঠ থেকে কাপড়টা সামান্য সরিয়ে দিন তো।'

যে মেয়েটি ওদের দিকে পেছন ফিরে শুয়েছিল তার পিঠ থেকে সন্তর্পণে কাপড় সরিয়ে নিতেই চমকে উঠল বাসুদেব। শংকর দত্ত বললেন, 'সাংঘাতিক।'

নার্স আবার কাপড়টি ঠিক করে দিতে ওরা বেরিয়ে এল। বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'এটা আপনি বলতে চাননি কেন?'

'এই অঞ্চলে আমি একমাত্র আগরতলার বাঙালি। ডাক্তার হিসেবে কাজ করছি বলে রেহাই পাচ্ছি। তবে শুনতে পেলাম ওরা ডাক্তারদেরও ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই মেয়েদের এখানে নিয়ে আসার পরেই ফোন এসেছিল। আমাকে শাসানো হয়েছে যেন কাউকে নিজের মুখে ওই ক্ষতের কথা না বলি। তাই আপনাদের আমি বলিনি, আপনারা দেখেছেন।' ডাক্তার উত্তর দিলেন।

শংকর দত্ত বললেন, 'এখন বুঝতে পারছি কেন ওরা ঘোষণা করেছিল আজ থেকে মেয়েগুলো খ্রিস্টান হয়ে গেল।'

যন্ত্রণাদায়ক কাজ করেও ওরা মাথা ঠান্ডা রেখে প্রত্যেকটি মেয়ের পিঠে ক্রশ চিহ্ন ছুরি দিয়ে এঁকে গেছে। যিশুখ্রিস্টকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তখন তিনি প্রচণ্ড যন্ত্রণা পাওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরকে অনুরোধ করেছিলেন আক্রমণকারীদের ক্ষমা করে দিতে। আজ বিকেলে যখন তাঁর তথাকথিত প্রচারকরা মেয়েগুলোর পিঠে ক্রশ চিহ্ন

আঁকছিল তখন নিশ্চয়ই তিনি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠেছিলেন। এত কষ্ট হয়তো তখনও পাননি। এখনও কি তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন এদের জন্যে?

চিঠিটা লিখে দেওয়ার পর হাল ছেড়ে দিয়েছিল সৌমিত্র। কোনও পেশেন্ট তার অপেক্ষাতে নেই, ওরা তাকে নিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ এবং গোপন ডেরায় রাখার জন্যে। এদের নিশ্চয়ই গাড়ির অভাব নেই কিন্তু গাড়ি ব্যবহার করার ঝুঁকি ওরা নিচ্ছে না। গাড়ির রাস্তায় ঘন ঘন পুলিশ পাহারায় আসে। আছে প্যারা-মিলিটারি অথবা বি এস এফের লোকজন। সৌমিত্র আবিষ্কার করল, হাল ছেড়ে দেওয়ার পর তার আর ঘুম আসছে না। চাটাইয়ের ওপর শুয়ে সে অন্ধকার জঙ্গলের অদ্ভুত সব আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। অথচ সমস্ত শরীরে তীব্র যন্ত্রণা রয়েছে, দুটো পা ক্ষতবিক্ষত, হাঁটুর ওপর থেকে কোমর পর্যন্ত মাস্‌লগুলো শক্ত হয়ে গিয়েছে। জীবনে এত দৌড় কখনও দৌড়োয়নি।

একটা ব্যাপার সে এখানেও লক্ষ করেছে। যে বাড়ি থেকে রাতের খাবার আসছে ওরা আছে তার ঠিক পেছনে। অথচ বাড়ির কোনও মানুষ কৌতূহলী হয়েও তাদের দেখতে আসছে না। হয় ওরা ভয়ে আসছে না নয়তো ওদেরও কৌতূহলী না হওয়ার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, সে যদি এখন থেকে আর না যেতে চায়? যদি এভাবেই শুয়ে থাকে? ওরা তো তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারবে না! ওরা নিশ্চয়ই তাকে মাথায় তুলে নিয়ে হাঁটবে না! সে যেতে না চাইলে ওরা কী করতে পারে? মারবে? মারুক, এখন তার কিছুই এসে যায় না। মেরে তো ফেলবে না। টাকার জন্যে ওকে ওরা বাঁচিয়ে রাখবেই।

চিঠিটা পৌঁছে গেলে বাড়িতে যে প্রতিক্রিয়া হবে তা সে আন্দাজ করতে পারে। পিতৃদেব যতই পুলিশে চাকরি করুন না কেন নিজের স্ত্রীর আদেশ শেষপর্যন্ত মেনে নেন সবসময়। অতএব মায়ের কান্নার কাছে আত্মসমর্পণ করে টাকা জোগাড় করতে বের হবেন। ওঁর বউমারও সমর্থন থাকবে টাকার বিনিময়ে স্বামীকে ফিরে পেতে। যদি সেটা সম্ভব হয় তা হলে কী বিরাট অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে তা সে কল্পনা করতে পারছিল না। বাসুদেবের কথা মনে পড়ল তার। বাসুদেবও কি টাকা দেওয়ার ব্যাপারটাকে সমর্থন করবে? এখানে যদি সে মরে যায় তা হলে পুরো পরিবার বেঁচে যাবে। পঁচিশ লাখ টাকার ব্যবস্থা তো করতেই হবে না বরং বিমা কোম্পানি থেকে বেশ ভাল টাকা পেয়ে যাবে ওরা। এমন তো হতে পারত, আগরতলার রাস্তায় দুর্ঘটনায় অথবা বাড়িতে বসে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে সে মারা গিয়েছে। তখন তো সত্যিটাকে ওরা মেনে নিতে বাধ্য হত।

হুট হুট। একজন প্রহরী চিৎকার করে উঠতেই জঙ্গলের ভেতর কোনও জন্তুর পালানোর শব্দ হল। সৌমিত্র উঠে বসল, 'কী ভাই, এই জঙ্গলে বাঘ আছে নাকি?'

ওরা কেউ কোনও কথা বলল না। সৌমিত্র হাসল, বাঘ হলে ছাগল তাড়াবার শব্দে ছুটে পালাত না। আচ্ছা, এরা পঁচিশ লাখের বদলে যদি এক কোটি টাকা চাইত তা হলে নিশ্চয়ই পি বি ছেলের আশা ছেড়ে দিতেন!

রাত তিনটের সময় ছেলেটি টর্চ হাতে ফিরে এসে বলল, 'চলুন।'

'কোথায়?'

'পেশেন্ট আছে।' নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল ছেলেটি।

'যথেষ্ট মিথ্যে কথা বলেছেন, আর কেন? আপনারা আমাকে তুলে এনেছেন টাকার জন্যে, আমি চিঠিও লিখে দিয়েছি তবু পেশেন্ট আছে বলার কী দরকার?' সৌমিত্র চিৎকার করল।

'আমাকে যা বলতে বলা হয়েছে আমি তাই বলছি ডাক্তার। উঠুন।'

'না। আমি কোথাও যাব না, এখানেই শুয়ে থাকব।'

'তা হলে তো আমাদের নেতার সঙ্গে আপনার আলোচনা করা হবে না!'

'নেতা? কে নেতা?'

'সেটা গিয়েই জানতে পারবেন।' এখানে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'সিকিউরিটির সমস্যা আছে।'

শব্দ করে হেসে উঠল সৌমিত্র, 'সিকিউরিটির প্রশ্ন! তোমরা এখন ত্রিপুরাতে রাজত্ব করছ, তোমাদের কথাই যখন শেষ কথা তখন তোমরা কাকে ভয় পাচ্ছ হে?'

'আপনার কী হয়েছে?'

'মানে?'

'হঠাৎ বাজে কথা বলছেন। শুনুন, এখানে যদি শুয়ে থাকেন তা হলে সমস্যা যেমন আছে তেমনই থাকবে। আর যদি নেতার সঙ্গে কথা বলেন তা হলে সেটা অনেক সহজ হতে পারে।'

সৌমিত্রর মনে হল ছেলেটির বয়স কম হলেও বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছে। টাকা যদি দিতেই হয় তা হলে নেতার সঙ্গে দরাদরি করে যতটা কমানো যায় ততটাই লাভ হবে। সে উঠল।

এদিকের জঙ্গল আরও গভীর এবং সে কারণেই অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওদের হাতে টর্চ আছে কিন্তু সবসময় জ্বালছে না। হাঁটার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল পথ ওদের চেনা। কিন্তু তাল রাখতে পারছিল না সৌমিত্র। যদিও এখন তারা দৌড়োচ্ছে না কিন্তু দ্রুত হাঁটার জন্যে তার শরীর গাছগাছালির সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিল প্রায়শই। দুটো পা যেন লোহার মতো ভারী হয়ে গেছে। সে একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল। ছেলেটি ফিরে এল তার কাছে, 'কী হল? হাঁটুন!'

'আর পারছি না। পা চলছে না।'

'চেষ্টা করুন। আর এক ঘণ্টা। ভোরের আগে এই জায়গাটা পেরিয়ে যেতে চাই।'

'কেন? এখানে কী আছে?'

'পাশেই একটা বাঙালি হিন্দুদের গ্রাম আছে।'

'ওরা এখনও এখানে আছে?'

'হ্যাঁ। ওই গ্রামেই আর্মির ক্যাম্প।'

'এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলে ওরা শুনতে পাবে?'

'আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন। ওরকম কিছু করলেই আপনাকে মেরে ফেলার আদেশ আছে।'

'কিন্তু ভাই, বিশ্বাস করো, আমার শরীরে একফোঁটাও শক্তি নেই।'

'ঠিক আছে, আস্তে হাঁটুন। কিন্তু কোনও চালাকির চেষ্টা করবেন না।'

কোথাও কোনও আলো নেই। এই জায়গাটা ভারতবর্ষ না হয়ে আফ্রিকা হলেও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। ওরা হাঁটা শুরু করল। কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ সামনের লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। টর্চের আলো যেখানে পড়ল সেখানে লেজের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে কুচকুচে কালো একটি সাপ। বেশ মোটা, বুক উঁচু উচ্চতায় দুলতে দুলতে সাপটা জিভ বের করে মুখের ভেতরে টেনে নিল।

সামনের লোকটি বন্দুক উঁচিয়ে ধরতেই ছেলেটি চাপা গলায় আদিবাসী ভাষায় কিছু বলতেই লোকটি সেটা নামিয়ে নিল। সৌমিত্র দেখল ছেলেটি কোমর থেকে একটা ছোট ছুরি বের করে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ছুড়তেই সেটা সাপের ফণার নীচে গেঁথে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ল সাপটা, পড়ে লেজ দিয়ে ঝোপের ওপর আঘাত করতে লাগল।

ওটাকে মেরে ফেলতে এরা দেরি করল না। ছুরিটা সাপের শরীর থেকে খুলে নিয়ে গাছের পাতা ছিঁড়ে মুছল ছেলেটি। তারপর বলল, 'চলুন।' যেন কিছুই হয়নি, কোনও ঘটনাই ঘটেনি।

মৃত্যু এত কাছে ওত পেতেছিল, আর কয়েক পা এগোলেই প্রথম লোকটি ছোবল খেত, কিন্তু এই ছেলেটি অথবা লোকগুলো যে সাপের থেকেও ভয়ংকর তা বুঝতে সময় লাগল না। একটুও উত্তেজিত হয়নি এরা, সাপটিকে মারার পর কোনও উল্লাস দেখায়নি। এদের সংখ্যা যত বেড়ে যাবে তত ভারতবর্ষের মানচিত্র বিপন্ন হবে। এরা এখন পুলিশ বা মিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষে যাচ্ছে না, শুধু অর্থ সঞ্চয় করে চলেছে। আর সেটা করার সময় এদের রক্ত সাপের চেয়েও ঠান্ডা থাকছে।

একসময় ভোর হল। আকাশ দ্রুত পরিষ্কার হয়ে আসছে। সাপের ঘটনাটির পর সৌমিত্র আবিষ্কার করল তার শরীরের যন্ত্রণা এখন আর তেমন তীব্র নয়। অন্তত আরও এক ঘণ্টা সে হেঁটে এসেছে কোনও কিছু টের না পেয়ে। মনের চাপ তা হলে এভাবেই শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এদিকের জঙ্গলটা বেশ ফাঁকা। ছেলেটি বলল, 'এখন কিছুক্ষণ এখানে বিশ্রাম নিতে পারেন।'

'কেন?' সৌমিত্র বিশ্রামের কথায় অবাক হল।

'সামনেই হাইওয়ে। প্রায়ই আর্মির গাড়ি যায়। একেবারে নিশ্চিন্ত না হয়ে আমরা রাস্তা পার হব না।' সে দুজন লোককে নির্দেশ দিতেই তারা রওনা হল।

সামনেই যদি হাইওয়ে হয় তা হলে গাড়ি এলে শব্দ পাওয়া যাবে। সেই শব্দ পেলেই যদি সে দৌড়োতে শুরু করে তা হলে আর্মির লোকজন নিশ্চয়ই তাকে গুলি করবে না। ওদের কাছে পৌঁছে গেলে সে নিরাপদে আগরতলায় ফিরে যেতে পারবে। ভাবনাটা সৌমিত্রকে উত্তেজিত করল।

'কী ভাবছেন?' ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল।

'আমি তো কিছু ভাবছি না।'

'গুড! পালাবার চেষ্টা করবেন না। দেখেছেন তো, আমার ছুরির হাত খুব খারাপ

নয়। আমাকে ওটা ছুড়তে বাধ্য করবেন না।' ছেলেটি বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাটা মাথা থেকে বেরিয়ে গেল। চোখের সামনে সাপটাকে ছুরিবিদ্ধ হয়ে আছড়াতে দেখেছে সে। সাপের শরীর যত মোটা হোক তার শরীরের কাছে কিছু নয়।

'আমরা আর কত দূর যাব?'

'চিন্তা কেন? পথ তো একসময় শেষ হবেই।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'পেশেন্ট আছে।'

'ধ্যুত।' শব্দ করে বিরক্তি প্রকাশ করল সৌমিত্র।

লোকদুজন ফিরে এল। ওরা যা বলল তা আন্দাজে বুঝল সৌমিত্র। কাছাকাছি কোনও বাড়িঘর নেই বলে জল পাওয়া গেল না। আর হাইওয়ে এখন ফাঁকা।

জল শুনে তেষ্টা পেয়ে গেল সৌমিত্রর। বলল, 'জল খাব।'

'পেলেই খাওয়াব।'

সৌমিত্র দেখল ছেলেটি একজন প্রহরীর ব্যাগ থেকে ব্যান্ডেজ বের করল। তারপর বলল, 'চোখ বন্ধ করুন। এখন থেকে আপনি কিছুই দেখবেন না। ওখানে পৌঁছে চোখ খোলা হবে।'

'কেন? আমি তো কিছুই চিনি না।' সৌমিত্র প্রতিবাদ করল।

'চিনতে কতক্ষণ?' ছেলেটি ওর চোখ ব্যান্ডেজে মুড়ে দিল।

কয়েক পা হেঁটে চলার পর আচমকা দৌড় শুরু হল। ওরা হাত ধরে থাকায় সব শক্তি দিয়ে ছুটতে বাধ্য হচ্ছে সে। ছেলেটি সমানে বলে চলেছে, 'কুইক, কুইক।' বোধহয় রাস্তা পেরিয়ে আবার জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার পর ওরা থামল। এবার ধীরে ধীরে পথ হাঁটা।

আধ ঘণ্টাটাক পরে ছেলেটি প্রহরীদের কাউকে বলল জল নিয়ে আসতে। সে চলে যেতে সৌমিত্র বসতে চাইল। আপত্তি করল ছেলেটি, 'এখন বসলে আর আপনি হাঁটতে পারবেন না।'

'আর কতক্ষণ হাঁটতে হবে? আমি আর পারছি না।' সৌমিত্র হাঁপাচ্ছিল।

'এই তো, বেশি দূর নয়।'

'আমাকে তোমরা কেন নিয়ে যাচ্ছ?'

'পেশেন্ট আছে।'

শব্দদুটো শোনামাত্র সব প্রশ্ন গিলে ফেলল সৌমিত্র।

জল নিয়ে এল লোকটি। চোখ-বন্ধ অবস্থায় যতটা সম্ভব খেয়ে নিল সৌমিত্র। খাওয়ার পর সে কথাটা ভাবতেই হাসি পেল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছেন কেন?'

'এ কোথাকার জল?'

'পুকুর কিংবা কুয়োর, কেন?'

'আগরতলায় তো বটেই, বুরাখাতেও আমি ফোটানো জল খেতাম। পুকুর তো দূরের কথা, আজকাল কুয়োর জল সরাসরি খাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারি না।

অথচ এই জল খেয়ে কী আরাম হল!'

ছেলেটি কোনও মন্তব্য করল না। আবার পথ চলা শুরু হল।

আগরতলায় ফিরতে ভোর হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই রিপোর্টটা টাইপ করে ই-মেইলে পাঠিয়ে দিল সে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এই খবর সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে। সঙ্গে ক্যামেরা ছিল না, এই ভুলটা তার আজকাল হয় না, আজ হল।

খবরটা পাঠানোর মিনিট পাঁচেক বাদেই অনুরোধটা এল। ছবি চাই। অন্তত মেয়েগুলোর পিঠের ছবি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাও।

টিভি খবর ছবি ছাড়াই প্রচার করলে তেমন গুরুত্ব পাবে না এটা বাসুদেব জানে। সে শংকর দত্তকে ফোন করল। ভদ্রলোক বোধহয় বিছানায় শরীর এলিয়েছিলেন। বাসুদেব বলল, 'আপনার কাছে একটা সাহায্য চাই। এটা একেবারেই ব্যক্তিগত।'

'বলুন।'

'আমাকে একবার ওই হাসপাতালে যেতে হবে। একটু যদি আপনার লোকদের অ্যালার্ট করে দেন।'

'কেন যাবেন?'

'আক্রান্তদের পিঠের ছবি তুলে আনা হয়নি। আমার হেডঅফিস চাইছে।'

'ও। হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে ক্যামেরা না দেখে অবাক হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আপনি খুব ডিস্টার্বড। অন্য দিনের মতো মুডে ছিলেন না।'

'থাকা সম্ভব নয়। কারণটা জানতে চাইবেন না।' বাসুদেব বলল, 'তা হলে ওই কথা রইল!'

'দাঁড়ান। আপনার উচিত হবে না একা দিনের বেলায় গাড়ি চালিয়ে অত দূরে যাওয়া। আপনি বরং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার বাংলোয় চলে আসুন।' শংকর দত্ত বললেন।

'আপনার বাংলোয়? কেন?'

'আরে মশাই, এক কাপ চা তো খেয়ে যেতে পারেন।'

'আপনি সারারাত ঘুমাননি—!'

'তাতে আমরা অভ্যস্ত—! আসুন।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে বাসুদেব যখন শংকরবাবুর বাংলোয় পৌঁছোল তখন রোদ বেশ তেজি হয়েছে। সদ্য স্নান সেরেছেন ভদ্রলোক। বললেন, 'বসুন। চায়ের সঙ্গে নাস্তা চলবে?'

'অনেক ধন্যবাদ। শুধু চা।'

কাজের লোককে নির্দেশ দিয়ে শংকর দত্ত বললেন, 'আপনাকে অত দূরে কষ্ট করে যেতে হবে না। অবশ্য আমাদের পুলিশ-ক্যামেরাম্যানের তোলা ছবি আপনার পছন্দ হবে না কিন্তু কাজ যদি চলে যায় তা হলে দেখতে পারেন। ওটা এখনই পেয়ে যাব।'

'আপনারা ছবি তুলিয়েছেন?' বাসুদেব খুশি হল।

'হ্যাঁ। কিন্তু সেই ছবি আমি আপনাকে অফিসিয়ালি দিতে পারি না।'

'ওয়েল, ঋণ রইল।'

'নো। ঋণ রাখা আমি পছন্দ করি না। কখন কার কী হয়, ঋণ আর শোধ করা হবে না।'

'তা হলে?' বুঝতে পারল না বাসুদেব।

'ডি আই জি সাহেবের ডাক্তার ছেলেকে এন.এল.এফ কিডন্যাপ করেছে অথচ তিনি ডায়েরি করেননি, পুলিশকে অ্যাকশন নিতে বলেননি, এ কথাটা ঠিক তো?'

'বোধহয় ঠিক।' মাথা নাড়ল বাসুদেব।

'বোধহয় কেন? আপনার কোনও সন্দেহ আছে?'

'ডায়েরি করেছেন কি না জানি না। তবে কলকাতা থেকে ফিরে সরাসরি ওঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেছি আপনাদের কয়েকজন, যাঁরা ওঁর জুনিয়ার ছিলেন, তাঁরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছেন।'

'ঠিক। ডি.আই.জি সাহেব ওঁদের পরামর্শেই কি ডায়েরি করেননি?'

হেসে ফেলল বাসুদেব। এখন সে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে। সে বলল, 'প্রথম কথা, পি. বি. এখন আর ডি.আই.জি নন। দ্বিতীয়ত, আমার সামনে অফিসাররা ওঁকে ডায়েরি না করার জন্যে কোনও পরামর্শ দেননি। তৃতীয়ত, ওঁর ছেলেকে এন. এল. এফ কিডন্যাপ করেনি।'

'মাই গড! এটা আপনি জানলেন কী করে?'

'রিপোর্টাররা কি সোর্স কখনও বলে!' বাসুদেব হাসল।

এইসময় একই সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে চা নিয়ে এল কাজের লোক, আর ইউনিফর্ম পরা একটি লোক বাইরের দরজায় স্যালুট করে দাঁড়াল। লোকটির হাতে বড় খাম।

শংকরবাবু মাথা নাড়তেই লোকটি এগিয়ে এসে খামটা দিল। শংকরবাবু বললেন, 'ঠিক আছে।' লোকটি চলে গেল। খামের ভেতর অনেকগুলো ছবি। গ্রামের ছবি। মাতব্বরদের কয়েকজন। মেয়েগুলোর মুখ। শংকরবাবু দুটো ছবি বাসুদেবের দিকে এগিয়ে দিলেন। ছবি নিল বাসুদেব। হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা একটি মেয়ের পিঠের ছবি। সেখানে ক্রশ আঁকা ক্ষতটি জ্বলজ্বল করছে। সামান্য রক্ত গড়াচ্ছে।

শংকর দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু এটা যে বানানো ছবি নয়, অর্থাৎ এই ছবি ওই ভিক্টিম মেয়েদের কারও তা প্রমাণ করবেন কী করে?'

প্রমাণ করবার দায় আমার নয়। কেউ যদি এটাকে মিথ্যে বলতে চায় তাকে যেতে হবে মেয়েগুলোর কাছে। আর এই মুখের ছবিগুলো তো মেয়েগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করবে।' বাসুদেব ছবিটাকে টেবিলে রাখল।

শংকরবাবু বললেন, 'আমার বাড়িতে কম্পিউটার আছে। আপনি এখান থেকে মেইল করে দিন। আর একটা অনুরোধ, আপনার শ্যালকের কিডন্যাপের ব্যাপারটা রিপোর্ট করুন।'

'কেন?'

'যখন একজন প্রাক্তন ডি.আই.জি পুলিশের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না

তখন সাধারণ মানুষ কী করে ভরসা পাবে এই প্রশ্নটা তোলা দরকার।'

'কিন্তু এটা করলে ডাক্তারের জীবন বিপন্ন হতে পারে। ওরা হুমকি দিয়েছে যেন পুলিশকে না জানানো হয়। তা ছাড়া খবরটা আমি দিলে পারিবারিক শান্তির বারোটা বাজবে।'

'কিন্তু শুধু এই কারণে আপনি একটা অন্যায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন?'

শংকর দত্ত চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন। বাসুদেব সেটা নিয়ে চুমুক দিল, 'আপনার ক্ষেত্রে হলে কী করতেন?'

'সেকথা এখন বললে বড় বড় শোনাবে। গতকাল আপনি যখন হাসপাতালে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন তখন আমার সহকর্মীদের অনেকেই সেটাকে অপ্রয়োজনীয় ভেবেছিলেন। অথচ আমার মনে হয়েছিল আপনি ঠিক বলেছেন। শুধু কথা শুনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, মেয়েদের চোখে দেখে এসে তা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আমার ক্ষেত্রে হলে আমি আপোশ করতাম না। আসুন।'

চা শেষ করে শংকর দত্তের সঙ্গে কম্পিউটাররুমে ঢুকল বাসুদেব। ছবিদুটোর কপি পাঠিয়ে দিল তার কেন্দ্রীয় দপ্তরে। তারপর সেগুলো শংকর দত্তকে ফিরিয়ে দিয়ে অশেষ ধন্যবাদ জানাল।

শংকর দত্ত বললেন, 'আপনার শ্যালককে ওরা নিয়ে গেছে। আমি ধরে নিচ্ছি ডি আই জি সাহেব ওঁর মুক্তিপণ জোগাড় করে ফেলবেন। এ-ব্যাপারে আপনার ভূমিকা কী?'

'আপনি যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত। মুক্তিপণ দেওয়া আমি সমর্থন করি না।'

'আপনি নিশ্চিত টাইগারদের কাজ এটা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করে না?'

'প্রয়োজন হলে করে। ওদের প্রেস যে দেখে সেই রিয়াং মাঝে মাঝে করে। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাকে ওরা যোগাযোগ করার সুযোগ দেয়নি।'

'ওদের সম্পাদককে চেনেন?'

'একবার দেখেছিলাম, লোকটা এখন ত্রিপুরায় আছে কিনা আমার সন্দেহ।'

বাড়ি ফিরে এসেই বিছানায় চলে গেল বাসুদেব। আর চোখ খুলে রাখতে পারছিল না। ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। রিসিভার তুলতেই নীলার গলা শুনতে পেল, 'তুমি কখন ফিরেছ?'

'ভোরবেলায়।'

'আশ্চর্য। ফিরে এসে একটা ফোন করতে পারনি! সারারাত আমি জেগে বসে আছি। সকালে যতবার ফোন করছি ততবার অ্যানসারিং মেশিনে তোমার গলা শুনছি। তুমি আমাকে কি পাগল করে দেবে?' নীলার গলায় উত্তেজনা।

'সরি। এত ঘুম পেয়েছিল যে—।'

'তুমি ঘুমাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ। কাল রাত্রে খুব টেনশন গেছে।'

'আমার ফোন শুনতে পাওনি?'
'না। এই পেলাম।'
'তুমি ঠিক আছ তো?'
'হ্যাঁ। হ্যাঁ। কটা বাজে এখন?'
'দুটো।'
'এত বেলা হয়ে গেছে! ওখানে কোনও খবর আছে?'
'হ্যাঁ। ওরা ফোন করেছিল। বাবা বলেছে অত টাকা জোগাড় করতে পারছে না। কিন্তু ওরা কোনও কথা শুনতে চায়নি। বলেছে তিনদিনের বদলে ছ'দিন সময় দিচ্ছে। টাকাটা চাই।'
'কোত্থেকে ফোন এল?'
'এক টাকার কয়েন ফেলে করা যায় এমন একটা ফোন থেকে।'
'ঠিক আছে। রাখছি।'
'তুমি কখন আসছ?'
'দেখি। তুমি বরং চলে এসো।'
'তোমার সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাড়িতে এই অবস্থা দেখেও কী করে আমি যেতে পারি! তুমিই কদিন এই বাড়িতে এসে থাকো।'
'ইম্পসিব্‌ল। রাখছি।' রিসিভার রেখে দিল বাসুদেব।
কাজের লোক রান্না করে রেখেছিল। স্নান সেরে খেতে বসে দেখল অদ্ভুত একটা তরকারি রেঁধেছে লোকটা। সেদ্ধ হওয়ার পর মশলা পড়ায় বস্তুটিকে চিনতে পারছে না সে। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী তরকারি?'
লোকটা দাঁত বের করে হাসল, 'আলুর খোসা।'
হতভম্ব হয়ে গেল। রান্নার গুণে সে আলুর খোসা চিনতে পারেনি। এ বাড়িতে কেউ আলুর খোসাকে খাওয়ার কথা ভাবে না। নীলা থাকলে তো রেগে যেত। লোকটা বলল, 'বাজার করা হয়নি। কাল আলু কুটবার সময় খোসাগুলোকে রেখে দিয়েছিলাম।'
খাওয়া শেষ করে ওকে বাজারের টাকা দিল বাসুদেব। তারপর নীলাকে ফোন করল, 'আজ চমৎকার খাওয়া হল। ডিমের ঝোল আর আলুর খোসার তরকারি।'
'কী! আলুর খোসা? ও বাজার করেনি? আমি তো টাকা দিয়ে এসেছিলাম।'
'শেষ হয়ে গিয়েছিল বোধহয়, আমার কাছে চাওয়ার সুযোগ পায়নি।'
'বলিহারি! অবশ্য খোসা না থাকলে আমরা আলু খেতে পারতাম না।'
'ঠিক। এবার অরিজিন্যাল ছেড়ে খোসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করো।'
'তুমি করো। সেদিন বলছিলে না, রাম নয়, রামায়ণ দশরথ আর রাবণের গল্প। রাখছি।'
রিসিভার নামিয়ে রেখে হাসল বাসুদেব। ঠিক কথা। দশরথ যদি কৈকেয়ীর মন পাওয়ার জন্যে ওইসব বর না দিতেন আর সে-কারণে রামচন্দ্রকে যদি বনবাসে না যেতে হত তা হলে কি রামায়ণ লেখা সম্ভব হত? ফলে দশরথের গুরুত্ব রামায়ণে অনেকটা।

দশরথের কথা ভাবতেই হঠাৎ কেঁপে উঠল বাসুদেব। লোকটার নাম দশরথ না?

সে দ্রুত কম্পিউটারের কাছে চলে এল। বোতাম টিপতে টিপতে ঠিক জায়গায় পৌঁছে স্ক্রিনে চোখ রাখল। হ্যাঁ, এই তো, লোকটার নাম দশরথ দেববর্মা। এসরাই বাজার গ্রামের সি পি এমের পঞ্চায়েত প্রধান। এরা এমন সি পি এম যারা পলিটব্যুরোর নাম শোনেনি। এই গ্রামে পুলিশ রাত্রে ঢুকতে চায় না। বেশ উত্তেজিত হয়ে ম্যাপ বের করল সে। মাথার ভেতর ধীরে ধীরে একটা মতলব জন্ম নিচ্ছে। জঙ্গলের নিয়ম কাঁটা ফুটে গেলে কাঁটা দিয়ে তা তুলতে হয়। এই নিয়মটাকে কাজে লাগাবে নাকি? অন্য কোনও রাস্তা যখন সামনে নেই তখন চেষ্টা করতে দোষ কী?

খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল সে। প্রচণ্ড ঝুঁকি রয়েছে কাজটায়। হিতে বিপরীত হওয়া অসম্ভব নয়। শ্বশুরমশাই একাজে কিছুতেই রাজি হবেন না। নীলা তো প্রবলভাবে বাধা দেবে। প্রথমত, ওরা তাকেই মেরে ফেলতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই কাজের জন্যে সৌমিত্রকেও ওরা শেষ করতে পারে। কিন্তু আর কোনও রাস্তা নেই। সে যে সময় চেয়েছে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে তার দুটো দিন পার হয়ে যাচ্ছে।

বিকেলবেলায় বাসুদেব চলে এল শ্বশুরবাড়িতে। পি বি বসেছিলেন বাইরের ঘরে। এই ক'দিনেই যে ওঁর চেহারা ঝড়ো কাকের মতো হয়ে গেছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। বাসুদেব ওঁর সামনে গিয়ে বসতেই তিনি বললেন, 'শুনেছ?'

'হ্যাঁ। ওরা সময় বাড়িয়েছে।'

'শুনলাম ওরা নাকি মাস রেপ করেছে।'

'ওরা নয়। ওদের অপোজিট গ্রুপ!'

'আমার কাছে একই হল। এখন যে করেই হোক টাকাটা জোগাড় করতে হবে।'

'আপনি এখনই কিছু করবেন না। সারাজীবন সততার সঙ্গে চাকরি করলেন, এখন যদি কাগজগুলো লেখে একজন প্রাক্তন ডি আই জি হয়েও আপনি পুলিশের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না তা হলে কী প্রতিক্রিয়া হবে ভাবুন তো!' বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

'কিন্তু আমি কী করতে পারি, বলো?' পি বি অসহায় গলায় প্রশ্ন করলেন।

'আপনার রিভলভারটা আমাকে দিন।' হাত পাতল বাসুদেব।

সৌমিত্র যখন আর পারছে না তখন ওরা চোখ খুলে দিল। ধাতস্থ হয়ে সে দেখল সূর্য মাথার ওপর থেকে সরছে আর পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাড়িটা। জঙ্গল শেষ, যেন হঠাৎই একটা ঝকমকে বাড়ি বসিয়ে দিয়ে গেল আলাদীনের দৈত্য। বাড়িটা কাঠের কিন্তু বিশাল। পাঁচিলটা টিনের। ছাদটাও। ছেলেটি বলল, 'এসে গেছেন।'

সৌমিত্র ভেবেছিল এর আগে যেমন হয়েছিল এবারও ওরা নিশ্চয়ই তাকে বাড়ির বাইরে চাটাই পেতে বসাবে। কিন্তু ছেলেটি পাঁচিলের গায়ের দরজা খুলে ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে বলল, 'আপনি বারান্দায় বসতে পারেন।'

বারান্দাটা মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে এবং কাঠের। সৌমিত্র সেখানে বসতেই মনে হল শুয়ে পড়লে বেশি আরাম পাবে। আজ সকাল থেকে জল ছাড়া কিছুই পেটে

যায়নি এবং এখন নিজের শরীরটাকেই বোঝা বলে মনে হচ্ছিল। সে শুয়ে পড়ল। পড়তেই অদ্ভুত দ্রুততায় ঘুম এসে গেল।

ঘুম ভাঙল যখন তখন সন্ধে নামছে। শাঁখের আওয়াজ হচ্ছে বাড়ির ভেতর থেকে। তার আশেপাশে কেউ নেই। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। এবার তার খুব খিদে লাগছিল। ওরা কোথায় গেল? এভাবে তাকে রেখে যাওয়া মানে ওরা ধরেই নিয়েছে তার পালাবার ক্ষমতা নেই। এইসময় বাড়ির ভেতর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল। কুকুরটা ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। এবার সে জন্তুটাকে দেখতে পেল। গলার বেল্টের সঙ্গে দড়ি ছিল, সেটার অর্ধেক ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। সোজা বারান্দায় নীচে এসে সৌমিত্রকে লক্ষ্য করে গর্জন করতে লাগল সেটা। এতকিছুর পরে যদি তাকে কুকুর কামড়ায় তা হলে আর দেখতে হবে না। সৌমিত্র ঠিক করল সে যে ভয় পেয়েছে তা বুঝতে দেবে না। হাসি হাসি মুখ করে সে ডাকল, 'আঃ, আঃ তু তু।' সে কোথায় পড়েছিল ভয় পেয়েছে বুঝতে পারলে কুকুর তার আস্ফালন বাড়িয়ে দেয়।

তিন-চারবার ডাকতেই কুকুরটা যেন কেমন ঘাবড়ে গেল। সে আবার একটু এগোতেই আদুরে ভাবভঙ্গি করতে লাগল প্রবলভাবে লেজ নাড়তে নাড়তে। এইসময় ভেতর থেকে একটি নারীকণ্ঠ কিছু চেঁচিয়ে বলল। সম্ভবত কুকুরটাকে ডাকল। আর সেটা শোনামাত্র কুকুরটা দৌড়ে ফিরে গেল যেখান থেকে এসেছিল সেখানে।

এইসময় একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পেল সৌমিত্র। বাড়িব ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। স্ত্রীলোকটির হাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালা। মুখ ঘোমটায় ঢাকা হলেও সৌমিত্র বুঝতে পারল এর বয়স পঞ্চাশের ওপর। দু'পা হাজায় ভর্তি। থালাটাকে সৌমিত্রর সামনে বসিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই ফিরে গেল স্ত্রীলোকটি।

সৌমিত্র দেখল জলের মধ্যে অনেকটা ভাত, একটা পেঁয়াজ আর লঙ্কা এবং লম্বা লম্বা কিছু তরকারি যার রং বেশ লাল। সন্ধের এই সময়ে সে কখনও ভাত খায়নি। তারওপর এটি নিশ্চয়ই পান্তাভাত আর চালগুলো নিশ্চয়ই বেশ মোটা ছিল। কিন্তু খিদের জ্বালা তাকে দুবার ভাবতে দিল না। জল নেই, হাত ধুয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই, সে মুঠোয় ভাত নিয়ে মুখে পুরল। ঠান্ডা ভাত। পেঁয়াজ আর লঙ্কার গ্রাসটা মন্দ লাগল না। তরকারি বলে যা ভেবেছিল তা যে মাছ হাতে নিয়ে বুঝতে পারল। কিন্তু মুখের কাছে ধরতেই তীব্র গন্ধ নাকে ঢুকল। এ নিশ্চয়ই শুঁটকি মাছ। মাছ পচে গেলে যে গন্ধ তা এরকম না। জীবনে কখনও শুঁটকি মাছ খায়নি সৌমিত্র। আগরতলায় অনেকেই খায় কিন্তু তাদের বাড়িতে চল নেই। মা একবার বলেছিল, রোজ যখন জ্যান্ত মাছ পাওয়া যাচ্ছে তখন শুঁটকি খেতে যাব কোন দুঃখে? আজ নাক বন্ধ করে মুখে পুরল সে। ঝাল ঝাল হলেও স্বাদ মন্দ নয়। কিন্তু গন্ধটা যেন পেটের ভেতরে ঢুকে গেল। খাওয়া শেষ হতেই স্ত্রীলোকটি আবার বেরিয়ে এল। এবার তার হাতে কাচের বোতল। বোতলটি রেখে থালা নিয়ে চলে গেল। ঘোমটা প্রায় ঠোঁট অবধি বলে তার মুখ দেখতে পেল না সে। কাচের বোতলটি বহু ব্যবহারে শ্যাওলার রং ধরেছে। ওতে জল আছে। এদের বাড়িতে কি কুয়ো অথবা নলকূপ আছে? জলের রংটাও ঈষৎ লালচে। এই জল সে আগরতলায় ভুলেও ছুঁত না কিন্তু এখন হাত ধুল।

তারপর সব দ্বিধা ছেড়ে দুঢোক গিলে ফেলল। ফাঁসির দিন ভোরবেলায় আসামি যদি বলে আমি ফোটানো জল ছাড়া খাব না তা হলে যেরকম শোনাবে এখন তার তো সেই অবস্থা। পেটখারাপ হতে পারে, জন্ডিসও হতে পারে। কিন্তু সেগুলো হওয়া পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখবে কিনা সন্দেহ।

এইসময় সে প্রাকৃতিক চাপ অনুভব করল। এদের হাতে পড়ার পর জঙ্গলের রাস্তায় সে জলবিয়োগ করেছে বেশ কয়েকবার কিন্তু শরীর কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত হয়েছিল বোধহয়। নইলে একবারও কোনও চাপ অনুভব করেনি কেন। এখন সেটা করছে। সৌমিত্র চিৎকার করল, 'কেউ আছ? কেউ আছেন এখানে?'

এইসময় পাঁচিলের দরজায় একটি লোক এসে দাঁড়াল। এই লোকটি তার পাহারাদারদের একজন। ও বাইরে কেন? সৌমিত্র বলল, 'আরে ভাই আমি টয়লেট যাব।'

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল, কিছু বুঝল বলে মনে হল না।

সৌমিত্র একটু সহজ করে বলল, 'বুঝতে পারলে না? পায়খানা— পায়খানা—।'

লোকটির মুখের ভাবের কোনও পরিবর্তন হল না।

তখন সে পেটে হাত বুলিয়ে ইশারায় বোঝাতে চাইল। লোকটি হাসল। তারপর ইঙ্গিতে বেরিয়ে আসতে বলল। অবাক হয়ে গেটের বাইরে যেতেই লোকটা আঙুল তুলে দূরের জঙ্গল দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ সৌমিত্রকে কর্মটি জঙ্গলে গিয়ে সারতে হবে। বোতলে তখনও বেশ খানিকটা জল রয়েছে। সৌমিত্র আর না দাঁড়িয়ে সোজা চলে গেল জঙ্গলের ভেতরে। হালকা হওয়ার পর জল ব্যবহার করতে করতে তার মনে হল, আজ পর্যন্ত কখনও একই জল সে এতভাবে ব্যবহার করেনি। কিন্তু ওকে যে লোকটা এখানে পাঠালে ও যদি এই সুযোগে জঙ্গলে পালিয়ে যায়! জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে পুলিশ বা মিলিটারির কাছে পৌঁছোয়? ওরা কি এই ব্যাপারটা চিন্তা করছে না? পেছনে খসখস আওয়াজ হতেই সে তাকাল। দু দুটো শেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যে মোটেই ভয় পায়নি তা মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। সৌমিত্রর মনে হল আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। অন্ধকার ঘন হচ্ছে। জঙ্গলে সাপ তো আছেই। সে দ্রুত বেরিয়ে এল বাইরে। লোকটি তাকে ইশারা করল ভেতরে যেতে।

সৌমিত্রর খুব রাগ হয়ে গেল। ওরা তাকে ধরে নিয়ে এসেছে। প্রথম দিকে মেরেছে, তারপর দৌড় করিয়েছে। সবসময় পাহারা দিয়েছে, পালালে বিপদ হবে বলে হুমকি দিয়েছে। কিন্তু ওসব যখন করছিল তখন নিজেকে বেশ মূল্যবান বলে মনে হচ্ছিল। আমার দাম পঁচিশ লক্ষ টাকা। ভি আই পি-দের যেমন বডিগার্ড থাকে আমারও আছে। আমার গুরুত্ব আছে বলেই আমাকে ওরা বন্দি করেছে। কিন্তু এখন মনে হল ওরা পাত্তাই দিচ্ছে না। পাহারা দেওয়া তো দূরের কথা জঙ্গলেও যেতে বলছে। হঠাৎ নিজেকে গুরুত্বহীন বলে মনে হচ্ছিল সৌমিত্রর। সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'আর সবাই কোথায়?'

আবছায়া অন্ধকারে লোকটি জবাব না দিয়ে পকেট থেকে বিড়ি বের করে দেশলাই জ্বেলে ধরাল। রেগে গেল সৌমিত্র। বেশ কড়া গলায় হুকুম করল, 'অ্যাই, আমাকে একটা দাও।'

তার বাড়ানো হাত দেখে লোকটা বুঝতে পারল। দ্বিতীয় বিড়ি বের করে সৌমিত্রর হাতে দিল। সৌমিত্র আদেশ করল, 'আগুন।'

লোকটা দেশলাই দিল না, বিড়ি ধরিয়ে দিল। দিয়ে কোমরের রিভলভারে হাত রেখে ইশারায় বলল, ভেতরে যেতে। লোকটা তার জন্যে রিভলভারে হাত রেখেছে বলে ভাল লাগল সৌমিত্রর। সে জোরে বিড়িতে টান দিতেই কাশি এল। কাশিটা সামলাতে সামলাতে ভেতরে চলে এল। এখন অন্ধকার। বিড়িটাকে ফেলে দিয়ে সে আবার উঠে বসল বারান্দায়। আর তখনই মশার ঝাঁক ছুটে এল তার দিকে। অন্ধকারেও তাদের পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এই মশা কামড়ালেই কি ম্যালেরিয়া হবে? ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া? পেটে ভাত পড়ার পর শরীরটা একটু চাঙ্গা হয়েছিল। সৌমিত্র চিৎকার করতে লাগল আবার, 'এই যে ভাই, জলদি এসো।'

এবার লোকটি একা নয়, আর দুজন তার সঙ্গে গেট পেরিয়ে এল।

সৌমিত্র চিৎকার করল, 'এত্ত মশা, এখানে থাকা যাচ্ছে না।'

অন্ধকারেও আকাশটাকে কালো দেখাচ্ছিল মশার জন্যে। যেন ডেলা পাকিয়ে উড়ছে ওরা।

ওরা বারান্দায় উঠে একটা ঘরের দরজা খুলে যা বলে হুকুম করল তার অর্থ একটাই হতে পারে। 'ভেতরে যাও।' সৌমিত্র দ্রুত অন্ধকার ঘরে ঢুকল। ঘরের কোণে একটা হ্যারিকেন ছিল। সেটা জ্বালিয়ে মশার ধূপ ধরিয়ে দিল লোকটা। তারপর দরজা বন্ধ করে ওরা বেরিয়ে গেল। ঘরটি গরম কিন্তু মশামুক্ত। স্বস্তি পেল সৌমিত্র। এরমধ্যেই তার হাত এবং গলার কিছু জায়গা ফুলে উঠেছে। যা হবার তা বোধহয় হয়ে গেল। ওরা তাকে প্রথম থেকেই এই ঘরে রাখতে পারত। ওরকম স্বাধীনতার কী দরকার ছিল। তার মনে পড়ল, গত বছর চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিল কলকাতায় কাজে গিয়ে। সেখানে বাঘেদের রাখা হয়েছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পালিয়ে যেতে যাতে না পারে তাই চারপাশে বিশাল খাল কেটে পাঁচিল দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টি এলে বাঘেদের ভিজতে হয় যদি ভেতরের গুহায় যাওয়ার কথা তাদের না মনে পড়ে। ওদের চেয়ে খাঁচায় আটকে থাকা সিংহরা বরং বেশ ভাল আছে। বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না। তার নিজের অবস্থা ওই বাঘেদের মতো।

ঘরে কোনও আসবাব নেই। নিজের জামাপ্যান্ট এখন অসহ্য বলে মনে হচ্ছে। ময়লা ঘামে বিটকেল গন্ধ বের হচ্ছে এগুলো থেকে। গেঞ্জিটাকে গায়ে রাখা যাচ্ছে না। শার্ট খুলে গেঞ্জি বের করে নিয়ে এল শরীর থেকে। এনে আরাম পেল। গেঞ্জিটাকে ছুড়ে ফেলে দিল এককোণে। তারপর আবার শার্টটা পরে নিয়ে মেঝের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

হ্যারিকেনের আলোটা কাঁপছে। ওরা তাকে কি এখানেই রাখবে টাকা না পাওয়া পর্যন্ত? বোঝা যাচ্ছে না। সেটা করলে তবু স্বস্তি। আচ্ছা, ওদের কাছে পরিষ্কার জামাপ্যান্ট চাইলে কীরকম হয়? চোখ বন্ধ করল সে। এভাবে শুলে কি তিনদিন আগে তার ঘুম আসত?

'ডক্টর!'

বেশ জোরে ডাকটা কানে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল সৌমিত্রর। সে চোখ মেলল। ঘরে এখন তিনজন লোক। একজন মোড়ায় বসে, বাকি দুজন দাঁড়িয়ে। এদের কাউকে সে কখনও দেখেনি। সেই ছেলেটিকেও আর দেখতে পাচ্ছে না সে।

যে লোকটা তাকে ডেকেছিল সে-ই মোড়ায় বসে আছে। একই গলায় লোকটা বলল, 'আমি তোমার অসুবিধে বুঝতে পারতেছি ডক্টর, কিন্তু কিছু করার নাই। ঘুম ঠিক আছে?'

'খুব ভাল।' উঠে বসল সৌমিত্র।

'তুমি খুব স্মার্ট লোক। এর আগে তোমার জায়গায় যারা আসছিল তারা তো মেয়েমানুষের মতো পায়ে পড়ত। আমার নাম জেস্টার।'

'জেস্টার?'

'নামটা আগে শুনেছ মনে হয়!'

'এটাই কি আপনার আসল নাম?'

'আসল নামের কথা এখন আর মনে নাই। ডক্টর, তুমি বাসুদেব রিপোর্টারের শালা?'

'কেন?'

'ডি আই জি যদি তোমার বাপ হয় তা হলে তোমার বোনকে তো সে বিয়া করছে।'

'হ্যাঁ।'

'গুড। এখন বলো, এখানে কোনও অসুবিধা হয় নাই তো?'

'আমাকে বলা হয়েছিল পেশেন্ট দেখতে হবে।' তাকাল বাসুদেব।

'নিশ্চয়ই দেখবে। কিন্তু ডক্টর, তোমাকে আর একটা চিঠি লিখতে হইব।'

'আমি তো লিখেছি।'

'হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ।' পকেট থেকে কাগজ আর কলম বের করে এগিয়ে দিল জেস্টার, 'দ্বিতীয় চিঠিটা না লিখলে ডি আই জি সাহেবের মাথা পরিষ্কার হইব না।'

সৌমিত্র প্রশ্ন করল, 'বাবা কি এখনও টাকা দেননি?'

'দুঃখের কথা আর কী বলুম ডক্টর। তার নাকি অত টাকা নাই। ভাবো, পুলিশের ডি আই জি-র ওই কথা শুনলে পাখিও হাসব। টাইম নিচ্ছেন। তুমি লিইখ্যা দাও, দেশের প্রয়োজনে ওই টাকা অবিলম্বে দিতে। না দিলে তুমি আর বাইচ্যা ফিরবা না। সামনেই পূজা আসতেছে, কথাটা যেন তারা খেয়ালে রাখে।'

বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে চিঠিটা লিখল সৌমিত্র। শুধু তার সঙ্গে জুড়ে দিল, বাসুদেবকে আমার কথা বলবেন। জেস্টার চিঠি পড়ে চোখ ছোট করল। 'কী কথা?'

'কিছু না। এইরকমই তো চিঠিতে লেখে।'

'বউয়ের কথা লিখলা না, মায়ের কথা লিখলা না, লিখলা ভগ্নিপতির কথা?'

'আপনি একটু আগে নাম বললেন, তাই।'

'হ্যাঁ। রিপোর্টার লোক ভাল। এন এল এফের গুন্ডারা এগারোজনকে রেপ করছে।

তাদের পিঠে খ্রিস্টানদের চিহ্ন আঁকছে। সেই খবর তোমার শালা সমস্ত দুনিয়ায় ঘোষণা দিচ্ছে। আমাদের কথাও বলে। কিন্তু ডি আই জি সাহেব একটা ভাল কাজ করছেন, পুলিশকে কিছু জানান নাই। সেই কারণেই তুমি বাইচ্যা আছ ডক্টর। ঠিক আছে, ডিনার দিতেছে, খাইয়া রেডি হও, যাইতে হইব।' জেস্টার বেরিয়ে গেল চিঠিটাকে নিয়ে।

তার মানে এখানেই যাত্রার শেষ নয়, আবার যেতে হবে। সেটা দৌড়ে যাওয়া হলেও কিছু করার নেই। পায়ের দিকে তাকাল সে। জুতোটা খুলে রেখেছিল, ফুলে গিয়েছে বেশ। ক্ষতবিক্ষত অবস্থা।

ঘণ্টা দুয়েক পরে খাবার এল। সেই একই মেনু। তবে এখন ভাত গরম, জলে ডোবানো নয়। তরকারি সেই শুঁটকি মাছের গরগরে ঝাল। অনেক কষ্টে বমি গিলে গিলে পেটে ঢোকাল ওগুলো। এটা না খেলে পরে হয়তো পস্তাতে হবে। হয়তো কাল বিকেলের আগে কিছু জুটবে না।

রাত বারোটা নাগাদ জেস্টার এল, 'শরীর ঠিক আছে ডক্টর?'

'পায়ের অবস্থা দেখুন। এই পা নিয়ে হাঁটা যায় না।'

জেস্টার পা দেখল। তারপর দরজার বাইরে দাঁড়ানো লোকদের কিছু বলল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোকটা ফিরে এল একটা কাপড়ের জুতো নিয়ে। জেস্টার বলল, 'ট্রাই করো!'

'কেন?'

'বেশি আরাম হইব।'

চামড়ার জুতো রেখে দিয়ে কাপড়ের জুতোয় পা গলিয়ে একটু আরাম হল। চামড়ার জুতো বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

জেস্টার একটা কাগজ কলম এগিয়ে দিল, 'ওষুধের নাম চাই।'

'কী ওষুধ?'

'সেটা জানো তাই তুমি ডক্টর। তোমার পায়ের যা অবস্থা তা অনেকের হয়।'

'এখানে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'সে চিন্তা তোমার না ডক্টর।'

অতএব নিজের দুটো পা সারাতে যে যে ওষুধ দরকার তার নামও লিখল, 'কখন হাতে পাওয়া যাবে?'

'জানি না।' জেস্টার উত্তর দিল।

শ্বশুরমশাই যেন এরকম অনুরোধ জামাইয়ের কাছ থেকে শুনবেন কখনও ভাবেননি। অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'রিভলভার নিয়ে তুমি কী করবে?'

'দরকার না থাকলে আমি চাইছি কেন?' বাসুদেব গম্ভীর মুখে কথা বলল।

'তোমার কীসের দরকার? একজন রিপোর্টার কখনও রিভলভার নিয়ে ঘোরে নাকি? তা ছাড়া আমার নামে লাইসেন্সড্ আর্ম আমি তোমাকে ব্যবহার করতে দেব

একথা ভাবলে কী করে?' পি বি উত্তেজিত।
'আমি রিভলভার চেয়েছি কিন্তু ব্যবহার করব তো বলিনি।'
'তা হলে ওটা নিয়ে কী করবে?'
'ওটা দেখালেও তো কাজ হয়।'
'হয়। কিন্তু তাকে হুমকি দেওয়া বলে। রিভলভার দেখিয়ে তুমি কাউকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারো না।'
'বেশ, আপনার যদি আপত্তি থাকে দেবেন না। আমাকে এক্ষেত্রে একটা রিভলভার কিনতে হয়।'
'কী সর্বনাশ? তুমি কোত্থেকে কিনবে?'
'আশ্চর্য, ত্রিপুরায় এত অস্ত্র আসছে কোত্থেকে তা আপনি জানেন, কোথায় তার কেনাবেচা হয় তাও অজানা নয়। তাই না?' উঠে দাঁড়াল বাসুদেব।
'আশ্চর্য, তুমি একজন সৎ রিপোর্টার হয়ে বেআইনি রিভলভার কিনবে? যদি ধরা পড় তা হলে আমার সম্মান থাকবে? না, না, এসব করো না।'
'আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে অথচ আপনি এখনও আইনের আশ্রয় নেননি এটা প্রচারিত হলে আপনার সম্মান থাকবে? আপনি জানেন না আপনার যাঁরা জুনিয়ার অফিসার ছিলেন তাঁরা চাইছেন ব্যাপারটাকে প্রচার করতে। আমাকেও তাঁরা অনুরোধ করেছেন। আচ্ছা, এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল তবু ত্রিপুরার কাগজগুলো ভেতরের পাতায় নিউজ করল, ডাক্তার অপহৃত বলে। আপনার কথা কোথাও লেখেনি। এটা কী করে সম্ভব হল তা আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারি। ছেলেকে বাঁচাতে আপনি নিজে সম্পাদকদের অনুরোধ করেছেন খবরটা নিয়ে হইচই না করতে। বলুন, করেননি?' বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।
মাথা নাড়লেন পি বি, 'হ্যাঁ, কিন্তু ওকে বাঁচাতে এটা করতে হয়েছে।'
'ঠিক। আমি আপনার কাছে রিভলভার চাইছি সৌমিত্রকে বাঁচাতেই।'
'কীভাবে সেটা সম্ভব?'
'আমি আজ আপনাকে ব্যাখ্যা করব না। আগামীকাল হয়তো বলতে পারব।'
পি বি কিছুক্ষণ দু হাতে মাথা টিপে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমার বেডরুমের আলমারির ওপরের তাকে ওটা আছে। কিন্তু আমি নিজের হাতে তোমাকে দিতে পাবব না।'
বাসুদেব ভেতরে ঢুকতেই শাশুড়ি তাকে ধরলেন, 'কিছু খবর পেলে বাবা?'
'এখনও সঠিক খবর পাইনি তবে পেয়ে যাব।'
'কবে পাবে? চিন্তায় চিন্তায় আমি তো পাগল হয়ে গেলাম।'
নীলা এল, 'ওরা আগরতলা শহর থেকে টেলিফোনে কথা বলল অথচ কিছু করা যাচ্ছে না?'
'না। কারণ যে ফোন করেছিল সে হয়তো এখানকার কোনও সরকারি অফিসে সামান্য কাজ করে। এই ফোনটা করাই তার দায়িত্ব। কোনও রেকর্ড নেই। পুলিশকে বললেও পাবলিক ফোন থেকে যে করেছে তা খুঁজে বের করতে পারত না।' বাসুদেব বলল।

'তা হলে কী হবে?'
'দেখি, আজ হয়তো খবর পাব।'
'কীভাবে?'
'আমাকে আজ একবার সিধাই যেতে হবে।'
'কেন?'
'ওখানে একজন পরিচিত লোক আছে যে খবরটা দিতে পারে।'
'তাকে ফোন করো, যাওয়ার কী দরকার!' নীলা বলল।
'ওটা প্রায় গ্রাম। কোনও ফোন নেই।'
'আমার ভয় করছে। ওখানে বাঙালি আছে?'
'থানার দারোগাই তো বাঙালি।'
'তিনি তো পুলিশ, পুলিশদের ওরা ধরে না। তোমার যদি কিছু হয়।'
'তোমার কথা শুনে চললে আগরতলা থেকেই বেরুনো যাবে না।'
'না। তুমি একা যাবে, একটা ছুরি যদি কেউ দেখায় তা হলেই হয়ে গেল!'
'বেশ। একা যাব না। তোমাদের ড্রাইভারকে বলো জিপটা চালাতে।'
প্রস্তাবটায় একটু স্বস্তি পেল নীলা। এ বাড়িতে দুটো ড্রাইভার ছিল। একজন পুলিশের চাকরির সূত্রে, আর একজন বাড়ির গাড়ি চালাত। অবসর নেওয়ার পর শুধু সে-ই আছে। লোকটার নাম বঙ্কিম, ভাল জোর আছে গায়ে। কিন্তু খালি হাতে ওরা কী বা করতে পারে।
নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে গেলে তুমি খবর পাবে?'
'একেবারে সিয়োর বলতে পারছি না, তবে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'
'কিন্তু তুমি খালি হাতে যাবে?'
'অস্ত্র কোথায় পাব?'
'তুমি এবার একটা রিভলভারের জন্যে অ্যাপ্লাই করবে।'
'বেশ। কিন্তু অ্যাপ্লাই করলে আজই তো ওটা হাতে পাব না। এক কাজ করো, কয়েক ঘণ্টার তো ব্যাপার, তোমার বাবার রিভলভারটা এনে দেবে?' বাসুদেব এতক্ষণে আসল কথায় এল।
'উরে বাবা। বাবা জানলে মেরে ফেলবে।'
'উনি জানেন।'
'জানেন মানে?' হাঁ হয়ে গেল নীলা।
'প্রথমে রাজি হননি। পরে নিতে বলেছেন কিন্তু উনি নিজের হাতে আমাকে দেবেন না।'
'কেন?'
'আমার কাছে ওটা রাখা বেআইনি।'
'কোথায় আছে?'
'ওঁর বেডরুমের আলমারির ওপরের তাকে। যাও নিয়ে এসো।'
নীলা একবার স্বামীর দিকে তাকাল। তারপর দ্রুত চলে গেল। মাঝে মাঝে বিগড়ালেও নীলা তার সঙ্গে ভালই ব্যবহার করে। এখন ওর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে শুধু

রিভলভার কেন, অন্য কিছু করতেও দ্বিধা করত না। নীলা ফিরে এল খাপ সমেত রিভলভার আর গুলির বাক্সটা নিয়ে।

'এতে গুলি ভরা আছে কি না জানি না।'

'ঠিক আছে। মা বা বউদিকে বলার দরকার নেই।'

নীলা মাথা নাড়ল।

'আসছি। ফিরে এসেই ফোন করব।'

'তুমি কি এখনই যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'দাঁড়াও, বঙ্কিমকে ডাকছি।'

ভেতরের বারান্দায় গিয়ে বঙ্কিমকে পাওয়া গেল। সিধাই যেতে হবে শুনে তার চোখ ছানাবড়া। বলল, 'আপনাদের মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? ওখানে গেলে জান নিয়ে ফেরা যাবে না।'

'তোমার জানের দায়িত্ব আমার। জিপটাকে বের করো। এই নাও টাকা, ফুল ট্যাঙ্ক তেল নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে আমার বাড়িতে চলে এসো। নীলা, আসছি।' বাসুদেব বলল।

'এসেই ফোন করবে। দুর্গা দুর্গা!'

বাসুদেবের ভাল লাগল। নীলার প্রার্থনা কাজে লাগুক।

অনেকগুলো পকেটওয়ালা সুতির জ্যাকেট আর জিন্‌স পরে নিল বাসুদেব। এখন সন্ধে। রাত্রে কোথায় আবার ছুটবে তা ঈশ্বর জানেন। অসময়ে অনেকে খেতে পারে, সে পারে না, তবু কিছুটা খেয়ে, কিছু সঙ্গে নিল সে। এইসময় বঙ্কিম গাড়ি নিয়ে এল তার বাড়িতে।

বঙ্কিম বলল, 'দিনেরবেলায় গেলে হত না স্যার?'

'না।'

'আমার খুব ভয় করছে স্যার।'

'তোমাকে গাড়ি চালানো ছাড়া কিছুই করতে হবে না।'

'কিন্তু আমাকে যদি ধরে নিয়ে যায়?'

'তোমাকে ধরবে কেন? ধরলে কী পাবে?'

'কী বলছেন স্যার। ওরা একটা রিকশাওয়ালাকে ধরেছিল। পাঁচ হাজার নিয়ে ছেড়েছে।'

'তারা দু নম্বরি। সন্ত্রাসবাদী নয়।'

ওরা যখন রওনা হল তখন সন্ধে সাড়ে সাতটা। আগরতলা পার হতেই রাস্তা ফাঁকা। ম্যাপটা টর্চের আলোয় দেখে রাস্তা বলে দিচ্ছিল বাসুদেব। বঙ্কিম গাড়ি চালাচ্ছে প্রায় রোবটের মতো। মুখে কোনও কথা নেই। মাঝে একবার রাস্তার পাশে চারটে ছেলে দেখতে পেয়ে ফিসফিস করে জানতে চেয়েছিল, 'গাড়ি কি থামাব না চালাব।'

'ওরা তোমাকে থামাতে বলছে না বঙ্কিম।'

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম গাড়ির গতি এত বাড়াল যে ছেলেগুলো অবাক হয়ে গেল।

অবশ্য এইসময়ে অন্ধকার রাস্তায় ওরা কী করছে এ নিয়ে সংশয় থাকতেই পারে। আশেপাশে তো গ্রাম ছাড়া কিছু নেই। সিধাই-এর কাছাকাছি এসে দেখা গেল রাস্তার ওপর বড় বড় পাথর সাজানো। দূর থেকে হেডলাইটের আলোয় সেটা দেখতে পেয়ে বঙ্কিম বলল, 'সর্বনাশ! গাড়ি থামালেই সর্বনাশ হবে।'

'পাশের মাঠে নেমে যাও।'

বলতে বলতেই বঙ্কিম একই গতিতে গাড়ি রাস্তা থেকে মাটিতে নামিয়ে দিল। জিপ বলেই ওইরকম এবড়োখেবড়ো মাঠের ঝামেলা কাটিয়ে আবার রাস্তায় উঠে আসতে পারল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। যারা ব্যারিকেড করেছিল তারাও আওয়াজ করল না।

'দেখলেন স্যার।' বঙ্কিমের গলা কাঁপছে।

'দেখলাম। খুব ভাল চালালে।'

'যদি আমাদের ধরত—!'

'ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে যেত না।এরা জঙ্গি কিংবা সন্ত্রাসবাদী নয়। স্রেফ ডাকাতি করার জন্যে রাস্তা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল।'

'কী করে বুঝলেন স্যার?'

'ওরা চোরের মতো লুকিয়ে থাকে না। রাইফেল নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।'

যেন কিছুটা স্বস্তি পেল বঙ্কিম। সিধাই এসে গেল। বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাব?'

'একটা জায়গায় দাঁড় করাও।'

এখন নটা বেজে গেছে। বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় লোকজন নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সাইকেলে আসা একটা লোককে থামিয়ে বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'থানাটা কোথায়?'

লোকটা মুখে কোনও কথা না বলে আঙুল তুলে বাঁ দিকটা দেখিয়ে চলে গেল।

সেদিকে কিছুটা যেতেই থানার আলো দেখতে পেল ওরা। তিনজন সেপাই বারান্দায় বসে আছে বন্দুক হাতে নিয়ে। জিপটাকে গেট পেরিয়ে একেবারে সিঁড়ির কাছে নিয়ে যেতে বলল বাসুদেব। গাড়ি থামামাত্রই দুজন সেপাই ছুটে এল, 'আরে, গাড়ি ভেতরে কেন? কী চাই?'

'দারোগাবাবু আছেন?'

'আছেন। কে আপনি? কী চান?' লোকটি বাঙালি।

সিধাই-এর ও সি ভাবতেই পারেননি ওইসময় কোনও রিপোর্টার জিপে চেপে তাঁর থানায় আসতে পারে। বাসুদেবের নাম তিনি শুনেছেন। সে রিপোর্ট পাঠালে তা সমস্ত পৃথিবীর মানুষ রেডিয়োতে শোনে, টিভিতে দেখে। এরকম একজন রিপোর্টার এসেছেন একা এইসময়ে তাঁর কাছে?

'কী ব্যাপার বলুন তো?' ভদ্রলোক খুব খাতির করে বসালেন।

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি অস্বাভাবিক কিছু করেছি।' বলল বাসুদেব।

'আলবত করেছেন। আপনার মা-বাবা পুত্রহারা হতে পারতেন, আপনার স্ত্রী বিধবা হয়ে যেতেন। এইসময়ে আমরাই দু-তিনটে গাড়ি ভর্তি সেপাই না নিয়ে কোথাও টহল

দিতে যাই না আর আপনি একজন ড্রাইভারকে নিয়ে এখানে চলে এলেন! আসবার সময় কোনও সমস্যা হয়নি?'

'হয়েছিল। রাস্তা জুড়ে পাথর সাজিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে আমরা গাড়ি থামাই।'

'থামাননি তো?'

'না।' বাসুদেব বলল, 'মনে হয়েছিল ওরা নেহাতই গ্রাম্য ডাকাত।'

'হ্যাঁ। এরাই আমাদের কাজ কমিয়ে দিয়েছে।'

'বুঝলাম না।'

'ডাকাতি হওয়ার ভয়ে লোকে আর সন্ধের পর আসা যাওয়া করে না। সন্ত্রাসবাদীদের গাড়িও আটকে যায়, দু-চারটে ডাকাত তখন ওদের গুলিতে মরে। বাকিরা পরে গ্রাম ছেড়ে ভয়ে পালায়।'

'ডাকাতরা ওদের সঙ্গেও টক্কর দিতে যায়?'

'গাড়ি দেখে বুঝতে পারে না। বুঝলে নিশ্চয়ই যেত না। তাই বলছিলাম, আমাদের আর ডাকাত ধরার জন্যে ব্যস্ত হতে হয় না। এখন বলুন কোথায় এসেছেন?' ও সি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনার এখানেই।'

'আমার সম্পর্কে কোনও খবর পেয়েছেন নাকি? দেখবেন মশাই, আমি পাবলিসিটি চাই না।'

'আমি আপনার সাহায্য চাই।' বাসুদেব বলল।

'নিশ্চয়ই। বলুন।'

'এখান থেকে এসরাইবাজার কত দূরে?'

'সর্বনাশ! এসরাইবাজারের খোঁজ নিচ্ছেন কেন?'

'আমাকে একবার যেতে হবে।'

'এখন যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি সুস্থ আছেন তো মশাই? ওটা ওয়ান অফ দি মোস্ট ডেঞ্জারাস এলাকা। দিনেরবেলায় আমরা যাই জানান দিয়ে, রাত্রে গেলে ফিরতে হবে না।'

'কেন?'

'রাত্রে যে কোনও আগন্তুককে ওরা শত্রু বলে মনে করে।'

'কিন্তু ওখানকার পঞ্চায়েত তো সি পি এমের দখলে?'

'এই সি পি এম কি কমুনিস্ট পার্টি মার্কসিস্ট ভেবেছেন? সি পি এম ব্যানারটা ব্যবহার করলে সুবিধে হয় বলে করে। কখনও কখনও বাধ্য হয়েছি বিশাল দল নিয়ে ওখানে রেইডে যেতে। কী করে যে আগাম খবর পেয়ে যায়, একবারও কাউকে ধরতে পারিনি। এরওপর আর একটা সমস্যা। ওখানকার মেয়েরা খুব লড়াকু টাইপের। পুলিশ দেখলেই দল বেঁধে এগিয়ে আসে। কিন্তু এসরাইবাজারে আপনার কী দরকার?' ও সি জিজ্ঞাসা করলেন।

বাসুদেব মুহূর্তে ভেবে নিল নামটা বলবে কি না। অতীত অভিজ্ঞতা ভাল নয় বলে সে বলল, 'আমি একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলব যার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল।'

'স্মৃতিশক্তি ভাল? আমি নাকের ডগায় থানায় বসে খবরটা পাইনি অথচ আপনি আগরতলায় বসে পেয়ে গেলেন। ওহো! ডি আই জি সাহেব তো আপনার শ্বশুর।' ও সি-র হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

'উনি এখন আর ডি আই জি নন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। তা হলে আপনার শালাকেই—!'

'হ্যাঁ।'

'কোনও খবর পেয়েছেন?'

'না।'

'কারা নিল?'

'বোঝা যাচ্ছে না।'

'দেখুন কী অবস্থা! শুনেছি ডাক্তার হিসেবে মানুষটা মন্দ ছিলেন না।'

'অতীত কাল ব্যবহার করছেন কেন? এখনও তো ওঁর মৃত্যুসংবাদ আসেনি।' বাসুদেব উঠে দাঁড়াল।

'আর বলবেন না। সব কাল এখন একাকার হয়ে যাচ্ছে।'

'তা হলে কীভাবে যাব বলুন!'

'সত্যি যাবেন?'

'আশ্চর্য! আমি কি মিথ্যে বলতে এত দূরে এসেছি?'

'তা হলে তো লোকজনকে ডাকতে হয়।'

'কাউকে ডাকতে হবে না। একটু আগে বললেন তো আপনারা ওখানে পৌঁছোবার আগেই সবাই হাওয়া হয়ে যায়। আপনি একটা কাগজে ওখানে পৌঁছোবার রোড ম্যাপটা এঁকে দিন।' বাসুদেব বলল।

ও সি গম্ভীর মুখে একটা কাগজে কয়েকটা লাইন এঁকে বললেন, 'এই যে রাস্তাটা, এটা দিয়ে সোজা মাইলখানেক যাওয়ার পর ডানদিকে রাস্তা পাবেন। রাস্তাটার দু পাশে দুটো বিশাল বটগাছ আছে। ভুল হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ওই রাস্তা ধরে আরও দু ক্রোশ গেলে পেয়ে যাবেন।

'তার মানে টোটাল পাঁচ মাইল?'

'হ্যাঁ। নতুন জায়গা, তার ওপর অন্ধকার। ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। তার মানে ওখানে মধ্যরাত। আর একবার ভাবুন মশাই। আগুনে হাত দিলে হাতটা পোড়ে।'

'কীভাবে হাত দিচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করছে।'

'বেশ। আমার বিবেক পরিষ্কার। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব অনেক অনুরোধ করেছি।'

'যদি চান তো বন্ড লিখে যেতে পারি।'

'তার দরকার নেই।' ও সি হাত নাড়লেন।

'আপনি যখন আমার নিরাপত্তা নিয়ে এত ভাবছেন তখন একটা সাহায্য চাইছি।'

'বলুন।'

'একটা সাইকেল পেতে পারি?'

'সাইকেল? অ। নিয়ে যান। ফেরত না পেলেও ক্ষতি নেই। চোরাই মাল উদ্ধার

করেছিলাম মাস তিনেক আগে। আজও কেউ ক্লেইম করেনি।'

'আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমার ড্রাইভারটাকে থানায় আশ্রয় দেবেন?'

'ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না?'

'এই অবধি ও কোনওমতে এসেছে, এখান থেকে এগোতে বললে ও বিদ্রোহ করবে।'

'থাক।'

বাসুদেব বাইরে বেরিয়ে দেখল বেঞ্চিতে বসে বঙ্কিম সেপাইদের সঙ্গে গল্প করছে। ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল বঙ্কিম। বাসুদেব বলল, 'তুমি এখানেই থাকো। যদি শোওয়ার জায়গা পাও ঘুমিয়ে নিয়ো। আমি হয়তো কাল সকালে ফিরব। যদি দুপুরের মধ্যে না ফিরি তা হলে বাড়িতে খবর দিয়ো।'

'স্যার!' বঙ্কিমের গলা ভিজে গেল।

'যা বললাম তাই করবে।' কথাগুলো বলতেই বাসুদেব দেখল একটা সেপাই সাইকেল নিয়ে তার কাছে আসছে। বাসুদেব সাইকেলটা নিল। আলো নেই, পুরনো র‍্যালে সাইকেল। এবং তখনই তার খেয়াল হল ও সি-র কথা যদি সত্যি হয় তা হলে অন্যভাবে বিপদ আসতে পারে। লোকগুলো নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করবে। আর তা হলে ওরা তার শরীরে তল্লাসি চালাবেই। রিভলভারটা হাতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। তার রিপোর্টার তকমাটা কোনও কাজেই লাগবে না। সে তো সেইসময় এক গ্রাম লোককে রিভলভার দেখিয়ে ভয় পাওয়াতে পারবে না। বাসুদেব সাইকেলটা নিয়ে জিপের কাছে গেল। এখন একটা পাশে জিপটাকে রেখেছে বঙ্কিম। সোজা ভেতরে ঢুকে সিটের পেছনে ফেলে রাখা টায়ারের নীচে রিভলভারটাকে রেখে দিল সে। চট করে কারও চোখে পড়বে না।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে দেখল বঙ্কিম অবাক হয়ে তাকে দেখছে। সে ভাবছিল সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে কী কারণে সাহেব জিপে উঠলেন। বাসুদেব বঙ্কিমকে ডাকল, 'আমি আসার আগে কেউ যেন জিপে না ওঠে। বুঝলে?'

বঙ্কিম নীরবে ঘাড় নেড়ে জানাল, সে বুঝেছে।

গেটের বাইরে থানার আলো যেটুকু পড়েছে তার বাইরে পৃথিবীটা অন্ধকার। সেখানে পৌঁছে সাইকেলে উঠে বাসুদেব দেখতে পেল ও সি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সে প্যাডেলে চাপ দিল। রাস্তাটা মাটির। কিন্তু শক্ত মাটি। দু পাশের বাড়িঘর অন্ধকারে ডুবে আছে। এখানে বোধহয় কেউ রাত জাগতে চায় না। মিনিট তিনেকের মধ্যে বাড়িগুলো পেছনে পড়ে রইল। এখন আর সাইকেল জোরে চালানো যাচ্ছে না। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় মাঝে মাঝেই বেশ বড় গর্ত। অন্ধকারে ভাল বোঝাও যাচ্ছে না। অনভ্যস্ত বাসুদেব দুবার পড়তে পড়তে সামলে নিল। একটা সময় মনে হল, সাইকেল না নিয়ে এসে হেঁটে এলেই ভাল হত। এখন দু পাশে মাঝে মাঝেই বড় গাছ। আকাশ পেছনে থাকায় গাছগুলোকে বোঝা যাচ্ছে। ও সি বলেছিলেন মাইলখানেক বাদে রাস্তাটা, যেটা চেনার উপায় হল দুটো বড় বটগাছ।

আধমাইল আসতে অনেক কসরত করতে হল। এদিকের রাস্তা সারাবার দায়িত্ব যাদের ওপর তারা নিশ্চয়ই টাকা নিচ্ছে কিন্তু সেটা আর খরচ করছে না। এইসব

লোক এত ক্ষমতাবান হয় যে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। বাসুদেব এখন রাস্তা ছেড়ে পাশের ঘাসের ওপর দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছিল। এবং হঠাৎই তার চোখে বটগাছদুটো ধরা পড়ল। সত্যি গাছদুটোকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। দুটো গাছের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটাই গিয়ে থেমেছে এসরাইবাজারে। এখন রাত প্রায় এগারোটা। পথ এখনও দু ক্রোশ বাকি।

বটগাছদুটোর নীচে আসামাত্র আচমকা শব্দে চমকে উঠল বাসুদেব। যেন কোনও বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। এই অন্ধকারে বাচ্চার কান্না কী করে শোনা যাবে। চারপাশে তো বাড়িঘরের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে একটু থামছে কান্না কিন্তু তারপরেই প্রবলভাবে ফিরে আসছে। শব্দটাকে খেয়াল করল সে। ওপর থেকে আসছে বলে মনে হল। ভূতপ্রেতে কোনওদিন বিশ্বাস করেনি বাসুদেব। নীলার আবার ওসবে খুব বিশ্বাস। দেবতা যখন আছেন তখন ভূত থাকবে না কেন? আজ এই নিঝুম রাত্রে লোকালয়ের বাইরে দুটো বিশাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হঠাৎ গা ছমছম করে উঠল। বেঘোরে প্রাণটা যাবে না তো? এবং তারপরেই কানে এল অদ্ভুত ডাক। এই ডাক পাখির। কোথায় যেন পড়েছিল শকুনের ছানার কান্নার সঙ্গে মানবশিশুর কান্নার মিল আছে। তার মানে গাছের মগডালের বাসায় শকুনের বাচ্চা কাঁদছে। একটু স্বস্তি এল। গ্রামের রাস্তায় সাইকেল চালাল সে।

এই রাস্তাটা তবু ভাল। জোরে চালানো যাচ্ছে না অন্ধকারের জন্যে কিন্তু টলতে হচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আকাশের প্রান্তে গাছগাছালি এবং বাড়িঘরের আভাস পেল। এবং আশ্চর্য ব্যাপার ওখানে আলো চিকচিক করছে। তার মানে এখনও মানুষজন জেগে আছে।

আর একটু এগোনোমাত্র কুকুরের ডাক ভেসে এল। গ্রামের কুকুরগুলো রাত্রে অচেনা মানুষ দেখলেই বিক্রম দেখায়। দাঁড়িয়ে গেল বাসুদেব। এখন সে গ্রামটার মুখে এসে পড়েছে। চিৎকার করতে করতে সারমেয়র দল ছুটে এসে থমকে দাঁড়িয়ে সমানে ডেকে চলেছে। ওদের দিকে এগোতে সাহস পাচ্ছিল না সে। এখন বোঝা যাচ্ছে রাত্রে পুলিশ এই গ্রামে এসে কোনও অপরাধীকে কেন খুজে পায়নি। এই কুকুরগুলোই গ্রামের লোকদের সতর্ক করে দেয়, ওরা বুঝতে পারে অচেনা মানুষ এসেছে। অতএব পালাবার সময় পেয়ে যায় ওরা। আর একটু এগোতেই কুকুরগুলো লাফিয়ে উঠল গর্জন করতে করতে। কিন্তু ওরা তার দিকে ছুটে আসছে না, আক্রমণ করছে না, একটা সীমা পর্যন্ত এসে আর এগোচ্ছে না। এইসময় গলা পাওয়া গেল। একাধিক ব্যক্তি যেন কুকুরগুলোকে ধমক দিচ্ছে। একটু পরেই তিনজনকে দেখা গেল। অন্ধকারেও আলো থাকে। অতএব সেই আলোতে তাকে দেখতে পেয়ে একজন ভেতরে ছুটে গেল। বাকি দুজন চিৎকার করে কিছু বলল। বাসুদেব বুঝতে পারল ওরা তার পরিচয় জানতে চাইছে। সাইকেল থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই গ্রামের ভেতর থেকে আরও কিছু মানুষ বেরিয়ে এল।

একটা হাত সাইকেলের হ্যান্ডেলে, অন্য হাত আকাশে তুলল বাসুদেব। লোকগুলো কাছে এগিয়ে এলে দেখা গেল প্রত্যেকের হাতে শক্ত লাঠি রয়েছে। ওদের একজন রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই?'

'আমি একজন রিপোর্টার।'

রিপোর্টার শব্দটা শোনামাত্র ওরা পরস্পরকে দেখল। প্রথম প্রশ্নটা এসেছিল উপজাতিদের ভাষায়। দ্বিতীয়টা এল বাংলায়, 'বাঙালি বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'বাঙালি রিপোর্টার হয়ে এই এলাকায় এসেছ, মতলবটা কী?'

'একজনের সঙ্গে দেখা করা খুব দরকার।'

'কার সঙ্গে?'

'দশরথ দেববর্মা।' বাসুদেব নামটা বলামাত্র ওদের প্রতিক্রিয়া দেখতে পেল। ওরা এই নাম আশা করেনি।

'তিনি এখন এই গ্রামে আছেন জানলে কী করে?'

'আগরতলার সি পি এম অফিসে গিয়েছিলাম। তারাই বলল উনি গ্রামে আছেন।'

'তিনি তোমাকে চেনেন?'

'জানি না। তবে তিনিই বলতে পারবেন চেনেন কি না!'

ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে একজনকে পাঠানো হল খবর দিতে। বাসুদেব দেখল ওরা কেউ কথা বলছে না। দশরথ যদি দেখা না করতে চায় তা হলে কী করবে ওরা? তারার আলোয় ওদের অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। এক-দুই করে বেশ কিছু মিনিট যাওয়ার পর লোকটা ফিরে এসে ঘোষণা করল তাকে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

সাইকেল সমেত তাকে প্রায় ঘিরে ধরে নিয়ে এল ওরা গ্রামের ভেতরে। ঘরগুলো ফাঁকা ফাঁকা, মাঝখানে একটা মাঠমতন জায়গা। যে কোনও দিক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু কেউ এলে এরা দূর থেকেই তাকে দেখতে পাবে। রাত্রে পাহারাদারির কাজ করা হয় কি না বোঝা যাচ্ছে না। একটি কাঠের বাড়িতে আলো জ্বলছিল। বেশির ভাগ বাড়ি কাঠের একতলা, এটি আয়তনে বড়। বাড়িটার দরজা খোলা, আলো বেরিয়ে এসেছে বাইরে। একজন দরজায় পৌঁছে জানাল, নিয়ে আসা হয়েছে।

'কে? কে? এখানে আসো!' গলা ভেসে এল।

সাইকেলটা একজনের হাতে ধরিয়ে বাসুদেব ভেতরে ঢুকল। একটা বড় হ্যারিকেন জ্বলছে, নীচে সম্ভবত তক্তাপোশের ওপর লুঙ্গি পরে খালি গায়ে যে লোকটি বসে আছে তার বয়স পঞ্চাশের ওপরে হলেও শরীরে শক্তি আছে। এরই নাম দশরথ, ত্রিপুরার জঙ্গি আন্দোলনের অন্যতম নেতার বাবা, এখানকার গ্রামপ্রধান। দশরথ বলল, 'চেনা চেনা লাগে!'

'আমি রিপোর্টার, বাসুদেব।'

'অ। তাই কও। ডি আই জি সাহেবের জামাই।' দশরথ হাসল।

'ওটাই আমার পরিচয় নয়। ওঁর মেয়েকে বিয়ে করার আগেই আমি রিপোর্টারি করতাম।'

'আরে তোমাকে তো সবাই জানে। তোমার গলা তো আমরা রেডিয়োতে শুনি। বসো, বসো রিপোর্টার। তোমাকে এখন এখানে দেখব, আশাই করি নাই।' দশরথ কথাগুলো বলামাত্র একটি লোক এগিয়ে গিয়ে ওর কানে ফিসফিস করে কিছু

বলতেই সে হেসে ফেলল। বলল, 'দেখো রিপোর্টার, এরা নিয়মের কথা বলতেছে। আরে তুমি এত দূরে আমাকে খুন করতে আসবা নাকি?'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল বাসুদেব।

'ওরা বলতেছে তোমার সাথে অস্ত্র আছে কি না পরীক্ষা করবে।'

'বেশ তো করুক।' বাসুদেব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

দশরথ ইশারা করতেই দুটো লোক তার শরীর, পোশাক পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হল। দশরথ তাদের ধমক দিয়ে ঘর থেকে চলে যেতে বলল, বলে হাসল , 'বসো রিপোর্টার, বসো।'

বাসুদেব বসল। সে বুঝতে পারছিল এই লোকটি অতি বুদ্ধিমান। এর সঙ্গে কথা বলতে হবে খুব সতর্ক হয়ে। দশরথ জিজ্ঞাসা করল, 'বলো এত রাত্রে আইল্যা কেন?'

কীভাবে কথাটা তুলবে বুঝতে পারছিল না বাসুদেব। এখানে আসার আগে সে যে রকমটি ভেবে এসেছিল সেভাবে এগোনো যাবে না। সে ভেবেছিল লোকটা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে। সৌমিত্রর অন্তর্ধান-প্রসঙ্গ নিজেই তুলবে এবং তখন সেই কথার সূত্র ধরে সে লোকটার মুখ থেকে কথা বের করতে পারবে।

বাসুদেব বলল, 'আপনি জানেন কি না জানি না আমার চাকরি সাহেবদের হাতে। সাগরের ওপারে যেখানে আমার রেডিয়ো আর টিভির হেড অফিস সেখানে বসে তারা শুধু হুকুম করে।'

'কী হুকুম?'

'এই করো, সেই করো।'

'তুমি রিপোর্টার তাদের চাকরি কর, হুকুম তো মানতেই হয়।'

'সেই হল কথা। নইলে চাকরি শেষ—!'

'ঠিক আছে, শুনব তোমার কথা। আগে কও, এখানে আইলা কীভাবে?' হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল দশরথ।

'সাইকেলে।'

'সেটা জানি।' সাইকেলটা পাইলা কোথায়? সিধাইতে কেউ আছে নাকি?'

মিথ্যে কথা বলে কোনও লাভ নেই। বাসুদেব বলল, 'না, কেউ নেই। সোজা থানায় গিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, তো তারা বলল এই রাতে এখানে আসবে না। তখন আমি একটা সাইকেল চাইতে ওরা দিয়ে দিল।'

'তুমি তো বেশ সত্যি কথা বল রিপোর্টার। তা আমার সাথে কী কথা তোমার?'

'ওই যে একটু আগে বলছিলাম—!'

'তোমার চাকরি—!'

'হ্যাঁ। ওরা জানতে চেয়েছে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষেরা কি স্বাধীনতা চায়?'

মাথা নাড়ল দশরথ, 'আমার উত্তর শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'শোনো। আমরা রাজাকে খুব ভক্তি করতাম। তিনি যখন ত্রিপুরাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করছেন তখন তাঁর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমি স্বাধীন ভারতের নাগরিক। আমার আর কী স্বাধীনতা দবকার?' দশরথ হাসল।

'আপনি সি পি এমের প্রবীণ নেতা। এখন যেসব আন্দোলন হচ্ছে তাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করেন না? আপনি বললেন, নতুন স্বাধীনতা চান না!' বাসুদেব কথা খুঁজছিল।

'রাত্রে খাইছ কিছু?' আচমকা প্রশ্ন করল দশরথ।

'এ্যাঁ?'

'এখন অনেক রাত্র। কিছু খাও তুমি।' বলে হাততালি দিল দশরথ। সেটা শোনামাত্র একটি লোক ঘরে চলে এল। দশরথ বলল, 'মেহমান আসছে, খাবার দিতে বলো।'

লোকটি চলে গেলে বাসুদেব বলল, 'আমার কিছু না হলেও চলে যেত।'

'না হলে তো সবই চলে! এই যে তার আছে কিন্তু বিজলি নাই, আমাদের চলতেছে না?'

'কারেন্ট দেয়নি?'

'আমরা নিই নাই। নিলেই তো পয়সা দিতে হইব। তা হলে এইটাই তোমার আসার কারণ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দেখো রিপোর্টার, আমি সি পি এম করি। কিন্তু আমার মত সি পি এম গরিবের বন্ধু। তাই এই গ্রামের কোনও মানুষ অন্য পার্টি করে না। ভাগাভাগি নাই।'

'তা হলে আপনারা সবাই নির্বাচনের সময় সি পি এম প্রার্থীকে ভোট দেন?'

'পঞ্চায়েতের সময় অবশ্যই। বিধানসভা অথবা লোকসভার সময় কে প্রার্থী সেইটা আগে দেখি। তখন আমি যা বলব লোকে তাই করে। আমি পরাধীন না। বুঝলা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু দলের আদেশ মানছেন না বলে পার্টি অ্যাকশন নেয় না।'

'সেইটা তাদের ব্যাপার, তাদের কাছে জবাব চাও।' দশরথ হাসল, 'তাইলে এই কথা জানবার জন্যে তুমি এই রাত্রে এত কষ্ট করলা?'

'কষ্ট আর কীসের!' বাসুদেব নড়েচড়ে বসতেই খাবার এল। এক থালা ভাত আর লালচে ঝোলওয়ালা মাংস। ওটার দিকে তাকিয়েই মনে হল প্রচুর পরিমাণে ঝাল দেওয়া আছে।

'খাও রিপোর্টার, খাও।'

'অতএব খেতে হল। এমন কুৎসিত মাংসের ঝোল সে কখনও খায়নি। রসুনের কড়া গন্ধ এবং ছিবড়ে হওয়া মাংস। এটা কীসের মাংস জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছিল না। হয়তো উত্তরটা শোনার পর সে আর খেতে পারবে না। কোনওরকমে গলাধঃকরণ করে সে হাত ধোওয়ার জন্যে বাইরে বেরুতেই দেখল ঘটিতে জল নিয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। মুখ হাত ধুয়ে সে তাকাল। বাইরের উঠোনে তখন জনাদশেক মানুষ বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে। অর্থাৎ তাকে এরা লক্ষ করে যাচ্ছে।

ঘরে ঢোকার পর দশরথ জিজ্ঞাসা করল, 'তা হলে রাত্রে এখানেই থাকো রিপোর্টার।'

'না না। আমি ফিরে যাব, কোনও অসুবিধে হবে না।'

'হইতে তো পারে। বড় রাস্তাটা তো আমার হাতে নাই। এখন দু নম্বরি উগ্রপন্থীরা

একটা বন্দুক হাতে পাইলেই হামলা করে সেখানে। তোমার কপাল ভাল যে আসার সময় কারও নজরে পড় নাই। এখন তোমার যদি কিছু হয় তো আমার খুব খারাপ লাগব। রাত্রে এখানে ঘুমাও, সকালবেলায় যাইতে পারো।' দশরথ বলল।

রাত্রে এখানে থেকে যাওয়াটা যেমন ঝুঁকি নেওয়া, এইসময় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলে তার চেয়ে কম ঝুঁকি হবে না। সে যখন ঘুমাবে তখন এরা খুন করতে পারে, মুখ বন্ধ করে কোনও গোপন ডেরায় নিয়ে যেতে পারে। তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

'রিপোর্টার, তামাক খাইবা?'

বাসুদেব দেখল চমৎকার দেখতে একটা ছোট হুঁকো এখন দশরথের হাতে। সে মাথা নাড়ল, 'না, আমি ধূমপান করি না!'

'সিগারেট?'

'না।'

'তুমি দেখতেছি মানুষটা ভাল।' ছোট ছোট টানে ধোঁয়া উপভোগ করল দশরথ। তারপরে বলল, 'ডি আই জি সাহেবের চাকরি শেষ?'

চমকে উঠল বাসুদেব। লোকটা এই গ্রামে বসে সব খবর রাখে। সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'পুলিশ কখনও ভাল মানুষ হয় না বলে শুনছিলাম। কিন্তু হয়, এই যেমন তোমার শ্বশুর।'

'হ্যাঁ। উনি সৎ বলেই ওঁর সহকর্মীরা ওঁকে ঠাট্টা করত।'

'করতে দাও। রিপোর্টার মরণ আইলে একাই যাইতে হয়। টাকা কেউ সাথে নিতে পারে না।'

'আমার শ্বশুরমশাইও তাই বলেন।'

'ওঁর শরীর কেমন?'

'ভাল।'

'বউ বাচ্চা? সব ভাল আছে তো?'

বাসুদেব বুঝতে পারছিল লোকটা অভিনয় করছে। ঘুরে ফিরে এই প্রসঙ্গে এল। সে বলল, 'এতদিন সবাই ভাল ছিল। এখন, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন!'

'কী রিপোর্টার? কী ব্যাপার?' হুঁকোটাকে একপাশে সরিয়ে রাখল দশরথ।

'ওঁর একমাত্র ছেলে ডাক্তার।'

'তার বুনরে তুমি বিয়া করছ!'

'হ্যাঁ। তাকে কদিন হল পাওয়া যাচ্ছে না।' স্পষ্ট গলায় বলল বাসুদেব।

'কী কও তুমি?' সোজা হয়ে বসল দশরথ।

'সবাই জানে। আপনি শোনেননি?'

'পেপারে আসছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু শ্বশুরমশাই পুলিশের কাছে ডায়েরি করেননি।'

'কেন? কেন?'

'ওরা বলেছে পুলিশকে জানালে ছেলেকে মেরে ফেলবে।'

'কারা? কারা করছে?'
'টাইগার।'
'টাইগার? টাইগার করছে তোমারে কে বলল?'
'আমি জানি।'
'হুম্‌। তারপর?'
'টাকা চেয়েছে। মুক্তিপণ।'
'কত?'
'পঁচিশ লক্ষ টাকা।'
'বাপ্‌স। এত টাকা ডি আই জি সাহেবের আছে?'
'না নেই। আপনি তো জানেন, উনি অত্যন্ত সৎ ছিলেন। ঘুষ নেননি।'
'তাইলে?'
'ধার করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অত টাকা পাবেন কোথায়?'
'ছেলেটারে কুথায় রাখছে?'
'সেটা জানি না।'
'কিন্তু রিপোর্টার, তুমি রেডিয়োতে এই কথা বল নাই!'
'কোনও প্রমাণ নেই কে কিডন্যাপ করেছে। আমি যেটা জানি সেটা নেহাতই আমার অনুমান। খবরটা প্রচারিত হলে যদি ডাক্তারের বিপদ হয় তাই চেপে আছি।' বাসুদেব বলল।
'ভাল করছ। পঁচিশ বড় বেশি হে।'
'হ্যাঁ।'
'কত দিতে পারবা?'
'পাঁচ হলে উনি পারবেন।'
হেসে ফেলল দশরথ, 'তুমি কি উন্মাদ? পঁচিশ থিকা কেউ পাঁচে নামে? বড় সমস্যা। তুমি তাইলে এই কারণে আসছ?'
'না। আপনি কথাটা না তুললে বলতাম না। মানে আপনাকে বললে তো সমস্যার সমাধান হবে না। মিছিমিছি পাঁচজনকে বলে কী লাভ!' ন্যাকামি করল বাসুদেব।
'দ্যাখো রিপোর্টার, পঁচিশ যখন পারবা না তখন সাড়ে বারোতে নামো। সাড়ে বারো আর আড়াই, পনেরো। তাই তো? দশ কম হল। ডি আই জি সাহেব এটা পারতে পারে।'
'জানি না। গিয়ে বলব।'
'তাইলে যাও, পাশের ঘরে গিয়া ঘুমাও।' বলেই হাততালি দিল দশরথ। সঙ্গে সঙ্গে আগের লোকটি ঢুকল। তাকে নির্দেশ দিয়ে দশরথ বাসুদেবকে ইশারা করল। লোকটাকে অনুসরণ করে বাইরে বেরুতেই কুকুরগুলো আবার চিৎকার শুরু করল। পাশের ঘরের কথা তাকে বলেছিল দশরথ কিন্তু লোকটা তাকে নিয়ে এল চারখানা বাড়ির পরে। একটা ঘরের দরজা খুলে ইশারায় ভেতরে ঢুকতে বলল। সেখানে একটা কুপি জ্বলছে। মাঝখানে একটা খাটিয়ার ওপর বিছানা পাতা। এ ছাড়া অন্য কোনও আসবাব নেই ঘরে। দরজা টেনে দিয়ে লোকটা বেরিয়ে গেলে বাসুদেব

আবিষ্কার করল দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই।

মাথা নাড়ল বাসুদেব। ওরা যখন ইচ্ছে তখন এই ঘরে ঢুকতে পারে। এখানে ঘুমানোটা নিশ্চয়ই নিরাপদ হবে না। অথচ দশরথের বিরুদ্ধে যাওয়া চলবে না। সামান্য আভাস পেলেই এই গ্রাম থেকে ওরা কোনওদিন বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে না। বাসুদেব খাটিয়াটাকে দেখল। পাতলা গদির ওপর চাদর পাতা। চাদরটাকে তুলে নিয়ে সে ঘরের অন্য দিকে চলে গিয়ে মেঝেতে বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কুপির আলোটা ঘরে ছায়া কাঁপাচ্ছে। সে আবার উঠল, ওটাকে নেভাল।

শোওয়ামাত্র ঘুম আসছিল না। একটা কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, দশরথ বুঝতে পেরেছে সে কেন এখানে এসেছে। লোকটা যথেষ্ট চতুর। বুঝেও না বোঝার ভান করছে। কিন্তু লোকটা নিজের কথায় ধরিয়ে দিয়েছে যে ওর সঙ্গে টাইগারের যোগাযোগ আছে। পঁচিশ লাখ টাকা খুব বেশি অতএব ঠিক অর্ধেক, সাড়ে বারো লাখে মুক্তিপণ নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে বলেছে তার নিশ্চয়ই সেটা বলার মতো ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ টাইগারদের ওপর দশরথের কথা বলাব অধিকার আছে। কিন্তু কেন? লোকটা সি পি এম করে আর টাইগাররা ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে মোটেই সমর্থন করে না। তা হলে? বাসুদেবের খেয়াল হল, সাড়ে বারো নয়, লোকটা আরও আড়াই চেয়েছে। এই আড়াই লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই কাজটা করে দেওয়ার জন্যে ওর কমিশন। লোকে যখন কমিশনের কথাটা পাকা করে নেয় তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে সে কাজটা পারবে। তা হলে এখানে আসায় আগে সে যেটা ভেবেছিল সেটাই সত্যি হতে চলেছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে জানে না, ঘুম ভাঙল রোদ উঠে যাওয়ার পর। উঠে দেখল তার মাথার পাশে জলের বোতল রাখা হয়েছে। সেটি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে মুখ ধুয়ে চোখ বন্ধ করে খানিকটা খেয়ে নিল সে। যে লোকটি গতরাতে তাকে এই ঘরে এনেছিল সে এসে দাঁড়াল সামনে। ইশারা করল অনুসরণ করতে। বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়ল বাসুদেব।

দশরথ বসেছিল একটা চাতালে। তার সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন লোক মন দিয়ে কথা শুনছিল। বাসুদেবকে দেখে সে ওদের বিদায় করল। হেসে বলল, 'বিছানায় কোনও দোষ ছিল?'

মাথা নাড়ল বাসুদেব, 'বাড়িতেও আমি খাটে শুই না। মেরুদণ্ডের ব্যথার জন্যে ডাক্তার মাটিতে শুতে বলেছে।'

'অ। ঠিক আছে রিপোর্টার, তুমি এখন যাইতে পারো। গিয়া কথা বলো শ্বশুরের সাথে।'

'এতে দেরি হয়ে যাবে।'

'কেন? আগরতলায় যাইতে কত সময় লাগে?'

'প্রথম কথা, এই ব্যাপারটা শ্বশুরমশাই বিশ্বাসই করতে চাইবেন না।'

'কীরকম শ্বশুর? জামাইরে বিশ্বাস করে না!'

'ঠিক তা নয়। তা ছাড়া ধরুন, উনি বললেন দশ আর দুই, বারো, তার বেশি কিছুতেই পারবেন না। কথাটা আপনাকে জানাতে আবার আমাকে আসতে হবে। হ্যাঁ,

এখন আপনি যদি বলেন পনেরোর এক পয়সা কম হলে আপনি নেই তা হলে অবশ্য আসবার দরকার হচ্ছে না—!' বাসুদেব বলল।

'কথা অসত্য না। মানুষ একটা বাইগুন কেনার সময় দরাদরি করে আর এ তো লাখ লাখ টাকা। ঠিক আছে, তার সঙ্গে ফোনে কথা বলো।'

'ফোনে? আপনি পাগল হয়েছেন? শ্বশুরবাড়িতে যত ফোন যাচ্ছে সব ট্যাপ হচ্ছে। টাকাপয়সার কথা হলে সেটা পরের দিন কাগজে বেরিয়ে যাবে, আপনার নামও ছাপা হবে।'

'আমার নাম? কারা এই ফোনে আড়ি পাতছে?'

'জানি না।'

'তা হলে তো মুশকিল হইল।

'আমি একটা কথা বলব?'

'কও।'

'আপনি যদি আমার সঙ্গে আগরতলায় যান তা হলে কাজটা চটপট হয়ে যায়।'

'আমি ডি আই জি-র বাসায় যাইতে পারি না রিপোর্টার।'

'আপনি আমার বাসায় থাকবেন। শ্বশুরমশাই আমার ওখানে এসে কথা বলবেন।'

'এটা অবশ্য মন্দ না।' দশরথ ভাবছিল।

'তা হলে?'

'না রিপোর্টার। আমার যাওয়া ঠিক না।'

'আপনি তো কাজেকর্মে আগরতলায় যান।'

'তা যাই।'

'বেশ। আপনার মনে যদি সন্দেহ থাকে তা হলে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

'না না।' দ্রুত বলে উঠল দশরথ, 'টাকার ব্যাপারে বেশি সাক্ষী রাখা ঠিক না।'

'আপনি আড়াই লাখ কমিশন পাবেন, টাকার অঙ্ক কমে গেলেও আপনারটা কমছে না।'

'বলতেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। চলো। সিধাই থেকে কীভাবে যাইবা?'

'গাড়িতে নিয়ে যাব আবার গাড়িতেই পৌঁছে দেব।'

'আজ বিকালের আগে—!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

দশরথ তার লোকদের ডেকে নির্দেশ দিল। একজন কিছু বলতে যাচ্ছিল, সে তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। কী করতে হবে বা হবে না নির্দেশ দিয়ে একটা সাইকেলে উঠে বসল দশরথ। বাসুদেব সামনে যাচ্ছিল। দশরথ বলল, 'আমারে আগে যাইতে দাও রিপোর্টার, তুমি পথ জানো না।'

দশরথ যে সিধাইতেও বেশ পরিচিত ও জনপ্রিয় তা একটু পরেই বোঝা গেল। কাল রাত্রে যে পথ জনমানুষশূন্য ছিল আজ দিনের আলোয় তা মনে হচ্ছে না। যারাই রাস্তায় হাঁটছে তারাই হাত তুলে দশরথকে অভিবাদন জানাচ্ছে। এর ফলে ওদের

একটু দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

থানার সামনে এসে দশরথ জিজ্ঞাসা করল, ‘কী ব্যাপার রিপোর্টার?’

‘আমি গাড়িটাকে এখানে রেখে গিয়েছিলাম।’

‘ঠিক করছ। রাস্তায় থাকলে এখন আর পাইতা না।’ দশরথ হাসল।

বাসুদেব থানায় ঢুকতেই ও সি হতভম্ব, ‘আপনি বেঁচে আছেন এখনও।’

‘অন্তত ভূত যে নই তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।’

‘আপনি ফিরে এলেন কী করে?’

‘গেলাম আর এলাম। আমার ড্রাইভার কোথায়?’

বঙ্কিম এল। বাসুদেবকে দেখে একগাল হাসল। বাসুদেব বলল, ‘গাড়ি চালু করো।’

‘যে জন্যে গিয়েছিলেন সে কাজটা হয়েছে?’ ও সি জিজ্ঞাসা করলেন।

‘অর্ধেকটা। এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি বাকিটা শেষ করতে।’

‘কাকে?’

‘শ্রীযুক্ত দশরথ দেববর্মা।’

‘করেছেন কী! বিশ্বাস করতে পারছি না।’

‘আড়াল থেকে দেখুন। সামনাসামনি হবেন না। উনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।’

‘তা হলে অর্ধেক কাজ কেন, আপনি ঠিক লোককে পেয়ে গেছেন।’

‘এটা যখন জানেন তখন আপনারা কেন যে পান না! আচ্ছা, চলি।’

বঙ্কিম গাড়িটা বের করতে বাসুদেব পেছনে উঠে বসল। বঙ্কিম বলল, ‘স্যার, আপনি ওখানে?’

‘চুপচাপ চালাবে। পেছনে তাকাবে না। যা বলব তাই করবে।’ ধমক দিল বাসুদেব।

‘ঠিক আছে স্যার।’

গেটের বাইরে জিপটাকে দাঁড় করাতে দশরথ এগিয়ে এল। বাসুদেব বলল, ‘পেছনে আসুন।’

উঠে বসল দশরথ, ‘পেছনে কেন? বেশি ঝাঁকুনি লাগবে না?’

সিধাই-এর রাস্তায় গাড়ি চলতে শুরু করলে বাসুদেব জিপের পেছনের ত্রিপলের ঢাকনাটা টেনে নামিয়ে দিল। দশরথ বলল, ‘এ কী! বন্ধ করল্যা কেন?’

‘আপনার জন্যে।’

‘মানে?’

‘এখানে সবাই আপনাকে চেনে। আমার সঙ্গে জিপে যাচ্ছেন, খবরটা চাউর হলে আপনার ক্ষতি হতে পারে। মানে, যে কাজে যাচ্ছেন!’ হাসল বাসুদেব।

‘রিপোর্টার, তুমি বেশ বুদ্ধিমান।’ দশরথ চোখ বন্ধ করল।

মুখোমুখি দুটো সিটে ওরা বসে। নীচে টায়ারটা রাখা আছে। সামনের দুটো সিট খালি, শুধু বঙ্কিম একমনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। সিধাই পার হওয়ামাত্র বাসুদেব টায়ারের খাঁজে হাত ঢোকাল। রিভলভারের বাঁটটাকে পেতে অসুবিধে হল না। দশরথ জিজ্ঞাসা করল, ‘কী খুঁজতেছ?’

রিভলভারটা তুলে সোজা লোকটার বুকের দিকে ধরল বাসুদেব, ‘একদম কথা

নয়। চুপ।'

'রিপোর্টার? তোমার মতলব কী?' প্রায় চিৎকার করে উঠল দশরথ।

'আর একবার আওয়াজ করলেই গুলি চালাব শুয়োরের বাচ্চা!' চাপা গলায় বলল সে।

'তুমি, তুমি—!' বিড়বিড় করছিল দশরথ।

'নিচু হ। নিচু হয়ে টায়ারের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। শো বলছি।' রিভলভার নাচাল বাসুদেব। মুখ বিকৃত করল যতটা সে করতে পারল।

জিপের দুটো সিটের মধ্যে জায়গা বেশ অল্প। কিন্তু তার মধ্যেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল দশরথ। বাসুদেব দ্রুত তার মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে গাড়ি মোছার কাপড়ে বেঁধে ফেলল মুখটাকে। তারপর সে বঙ্কিমকে ডাকল, 'তোমার কাছে আর কাপড় আছে?'

'আছে।' বঙ্কিম তাকাচ্ছিল না।

'দাও।'

বঙ্কিম দুটো লাল রঙের কাপড় পেছনে ফেলে দিল। একটা দিয়ে দশরথের হাত পেছনে মুড়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল সে। দ্বিতীয়টাতে চোখ বাঁধল। দশরথ গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু জিপের আওয়াজে সেটা তেমন জোরালো শোনাচ্ছিল না। আগরতলার কাছাকাছি এসে বাসুদেব বলল, 'এবার বাঁ দিকে ঘুরবে।'

বঙ্কিম মাথা নাড়ল।

এই খামারবাড়িটা কিনেছিলেন বাসুদেবের বাবা। অনেকটা জায়গা নিয়ে একটা টিলার ওপর বাড়ি। এককালে চাষ হত, মুরগি ছিল, গোরুও ছিল। কিন্তু আন্দোলন শুরু হওয়ার পর সেগুলো রাতবিরেতে হামলা করে নিয়ে যাওয়া শুরু হওয়ার পর এমনি ফেলে রাখা হয়েছে। একজন চৌকিদার থাকে এখানে। সে নিজে সবজি ফলায়, মুরগির চাষ করে। হাতে সময় থাকলে মাসে একবার যায় বাসুদেব। নীলা অনেকবার বলেছে, 'অতখানি জমি, বিক্রি করে দাও। পরে দেখবে, ওটাও জবরদখল হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু বাবার স্মৃতির কথা ভেবে বিক্রি করার ইচ্ছে হয়নি বাসুদেবের।

হর্ন দিতে চৌকিদার এসে গেট খুলল। বাসুদেব নেমে দাঁড়াল জিপ থেকে। চৌকিদার তাকে দেখে হাত জোড় করতেই বাসুদেব তার কাঁধে হাত দিল, 'ঘরদোর ঠিক আছে?'

'একদম ঠিক।'

'আমার সঙ্গে একজন গেস্ট আছে। যদি কেউ এখানে আসে আমাকে আগে জানাবে। আমাদের গেস্ট কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। তিনি যে এখানে আছেন তাও যেন কেউ না জানে।'

'ঠিক আছে সাহেব।'

'বঙ্কিমের পাশে উঠে বসতেই সে জিপটাকে নিয়ে সোজা চলে এল টিলার ওপরে। নীচে গেটের পাশেই চৌকিদারের ঘর। টিলার ওপরে কেউ আসে না। ত্রিপলটা সরিয়ে বাসুদেব ডাকল, 'এই হারামজাদা, চটপট নেমে আয়।'

চেষ্টা করেও সোজা হয়ে বসতে পারছিল না দশরথ। দীর্ঘ সময় অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে

উপুড় হয়ে থাকায় তার শরীর সোজা হচ্ছিল না। বুঝতে পেরে সাহায্য করল বাসুদেব। ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে সোজা ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করল সে। এই বাড়িতে দুটো বেডরুম একটি বসার ঘর। এখানে কেউ সজোরে চিৎকার করলেও কাউকে শোনাতে পারবে না। প্রথমে মুখ খুলল সে। মুখের ভেতর থেকে রুমাল বের করে নিতেই কাশি শুরু হয়ে গেল। প্রবলভাবে কাশতে লাগল দশরথ।

দরজায় শব্দ হল। বাসুদেব দেখল বঙ্কিম এসে দাঁড়িয়েছে। সে গম্ভীর গলায় হুকুম করল, 'দেখো তো, একটা গ্লাসে জল আনতে পার কিনা!'

বঙ্কিম ছুটল। এই বাড়িতে সে এর আগে বহুবার এসেছে কিন্তু এরকমভাবে কাউকে নিয়ে আসেনি। তার মালিক পুলিশের ডি আই জি ছিলেন, জামাই রিপোর্টার। কিন্তু জামাই যে এরকম একটা কাজ করতে পারে তা তার ধারণায় ছিল না। কিন্তু সে বুঝেছিল এসব কাজ করতে হচ্ছে দাদাবাবুকে উদ্ধার করার জন্যে। জল এনে দিতে দশরথ কোনওমতে দু ঢোঁক গিলল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এসব কী ব্যাপার! আমাকে যন্ত্রণা দাও কেন রিপোর্টার?'

'এখনও কিছুই পাওনি শয়তান। এবার পাবে।'

'তুমি কী ভাষায় কথা বল? অ্যাঁ। আমি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করি নাই!'

'কেন করবি? তোর ছেলে সাড়ে বারো, তুই আড়াই লাখ ঝাড়বি, খারাপ ব্যবহার কেন করবি। শোন, আমি বেশি ঝামেলা করতে চাই না, ডাক্তার কোথায় আছে?'

'ডাক্তার! আমি কী জানি! তুমি বললা টাইগারে নিছে।'

'তুই না জানলে টাকাটা কামাবি কী করে?'

চুপ করে গেল দশরথ। এখনও তার চোখ এবং হাত বাঁধা।

'তোর ছেলে কোথায়?'

'আমার ছেলে!' অস্পষ্ট গলায় বলল দশরথ।

'সে কোথায়?'

'আমি জানি না রিপোর্টার।'

সপাটে চড় মারল বাসুদেব। মারতেই লোকটা ঘুরে মেঝের ওপর পড়ে গেল। পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। দু হাতে আবার বাসুদেব ওকে তুলল, 'তোর ছেলে কোথায়?'

'বলছি তো, আমি জানি না। সে ঘর ছাড়ছে অনেকদিন। পুলিশের ভয়ে সে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকে। তা ছাড়া আমি সি পি এম আর সে উগ্রপন্থী। তার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নাই। মুখ দেখতে চাই না তার।' দশরথ বলতে বলতে মাটিতে থুতু ফেলল।

'তা হলে টাকাটা কামাতিস কী করে?'

'আমি যাইতাম! টাইগারদের কাছে যাইতাম।'

'কোথায় গেলে তাদের দেখা পেতিস।'

'আমি জানি না।'

'আবার খেপে গেল বাসুদেব। হাত চালাল সে। কিন্তু গোঙানি ছাড়া দশরথের মুখ থেকে একটি কথাও বের করা যাচ্ছিল না। সে দশরথের শার্টের পকেট দেখল। কিছুই

নেই। পাঁচখানা দশ টাকার নোট ছাড়া। প্যান্টের পকেটে পরিষ্কার রুমাল আর কিছু খুচরো। কোমরে হাত বোলাতে ছোট শক্ত কিছু অনুভব করে জামাটা তুলল বাসুদেব। মোবাইল ফোন। খুব ছোট। দেখলেই বোঝা যায় অন্তত হাজার পঁচিশেক দাম।

'এটা কোত্থেকে পেলি?'

'কিনছি।'

'এত টাকার জিনিস তুই গ্রামে বসে কিনেছিস?'

'হ। টানা মাল। সস্তায় পাইছিলাম।' দশরথ বলল।

মিথ্যে কথা বলছে। বাসুদেব বুঝতে পারছিল, লোকটার সর্বাঙ্গে মিথ্যে জড়ানো। কথা, চাহনি, ভঙ্গিতেও। ডাক্তারের খবর পেতে হলে এই লোকটিকে মুখ খোলানো ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমাকে কেন এখানে এনেছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।'

'না রিপোর্টার। বুঝি নাই। শুনছিলাম তুমি নাকি ভাল মানুষ। এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবা আমি চিন্তাও করি নাই। তোমার বাপের বয়সি আমি।' দশরথ কাতর গলায় বলল।

'তুমি বোঝনি?'

'না।'

'ডি আই জি সাহেবের ডাক্তার ছেলেকে কারা নিয়ে গেছে?'

'তোমার মুখে টাইগারদের নাম শুনলাম।'

'তুমি জানতে না?'

'আমার সাথে টাইগারদের কোনও সম্পর্ক নাই।'

'তোমার ছেলের সঙ্গে নেই?'

'না। সে রাষ্ট্রদ্রোহী।'

এত জোরে কথাগুলো বলল দশরথ যে হেসে ফেলল বাসুদেব। সেটা লক্ষ করে দশরথ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি হাসতেছ রিপোর্টার?'

'না হেসে পারলাম না। তুমি জঙ্গলে গিয়ে চিৎকার করে বলবে পঁচিশ লাখ টাকার বদলে তোমরা সাড়ে বারো লাখ নাও আর টাইগাররা রাজি হয়ে যাবে এরকম কথা কেউ বিশ্বাস করবে? আমি জানি তুমি তোমার ছেলেকে বলবে অঙ্কটা কমাতে। ঠিক কি না?' বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

'একদম ঠিক না। সে জীবিত না মৃত তাই জানি না।'

'এখন জানবে।'

'মানে?'

'শোনো হে রামচন্দ্রের বাপ। এই জায়গা থেকে সবচেয়ে কাছের মানুষের বাড়ি আধমাইল দূরে। তুমি হাজার চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। তুমি শুধু তোমার ছেলের ঠিকানা বলো।'

'আমি জানি না রিপোর্টার।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

'এই একই কথা আমি পুলিশরেও বলছি। তারাও কোনও প্রমাণ পায় নাই।'

'আমি পাব।' বাসুদেব মোবাইল ফোনের বোতাম টিপল। ফোনবুক টিপে দেখল সেখানে ফোন নাম্বার এন্ট্রি করা নেই। কী করা যায় সে ভাবতে পারছিল না। এই লোকটাকে শুধু মারধর করে কোনও লাভ হবে না। মুখই খুলবে না দশরথ।

ওকে ঘরে রেখে সে বাইরে এল। বঙ্কিম দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। তাকে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তারদাদার খবর কিছু বলল?'

'না।'

'ধোলাই দেব সাহেব?'

'কোনও লাভ হবে না। কী করা যায়?'

'আগরতলায় নিয়ে চলুন। পুলিশের হাতে পড়লে—!'

'ছেড়ে দিতে হবে। ওর বিরুদ্ধে কোনও কিছু প্রমাণ করা যাবে না।' বলতে বলতে ওপাশের দেওয়ালটার ওপর দৃষ্টি গেল বাসুদেবের। গোটাচারেক টিকটিকি ওত পেতে আছে। স্বাভাবিক চেহারার নয় এগুলো, আগরতলার বাড়ির দেওয়ালে যাদের দেখা যায় তাদের থেকে কিছুটা বড়। সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ওপর লেখা একটা বইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। আমেরিকানরা বন্দি ভিয়েতনামীদের পেট থেকে খবর বের করার জন্যে যেসব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল তার মধ্যে অন্যতম হল টিকটিকি। প্রচণ্ড মার খেয়েও ওরা মুখ খুলত না, মৃত্যুভয় ওদের কাবু করতে পারেনি। কিন্তু টিকটিকির কাছে ওরা হার মানতে বাধ্য হত। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমকে বলল, 'একটা বেতের মুখ বন্ধ বাক্স জোগাড় করতে হবে। ওই ঘরে আছে কিনা দেখো।'

মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটা মাঝারি সাইজের বেতের বাক্স নিয়ে ফিরে এল। বাসুদেব আঙুল তুলে দেখাল, 'ওখানে প্রচুর টিকটিকি আছে। গোটাছয়েক ধরে আনো।'

'টিকটিকি ধরব?' বঙ্কিম হতভম্ব।

'হ্যাঁ।'

'যদি কামড়ে দেয়!' বঙ্কিম সাহস পাচ্ছিল না।

'দিলে দেবে।' বাসুদেব আর দাঁড়াল না। ঘরে ঢুকে দেখল হাত বাঁধা অবস্থায় দশরথ একটা চেয়ারে বসেছে। তাকে দেখে হাসার চেষ্টা করল, 'রসিটা খুইল্যা দাও রিপোর্টার।'

বাসুদেব দুটো দড়ি খুঁজে বের করে প্রথমে দশরথের প্যান্টের প্রান্তদুটো টাইট করে বেঁধে ফেলল। দশরথ বলল, 'এটা কী করতেছ রিপোর্টার?'

বাসুদেব জবাব দিল না। এবার পাদুটো এক করে বেঁধে ফেলল। তারপর বেশ জোরে ধমক দিল, 'ওঠ। উঠে দাঁড়া।'

দশরথ বলল, 'রিপোর্টার, তুমি এটা ঠিক করতেছ না। আমি পার্টি করি।'

'পার্টি করি! তোর পার্টির নেতাদের তুই পাত্তা দিস? উঠে দাঁড়া।'

দশরথ উঠল। সেই অবস্থায় তাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলল বাসুদেব। এইসময় বঙ্কিম ঘরে ঢুকল। তার এক হাতে বেতের বাক্স অন্য হাতে লম্বা চিমটি।

বলল, 'এনেছি।'

'ওটাকে ওর সামনে রাখো।'

বেতের বাক্সটাকে বঙ্কিম নামিয়ে রাখল দশরথের সামনে। দশরথের চোখ ছোট হল।

'এবার ওর প্যান্টের বোতাম খুলে দাও। কোমরের বেল্ট খুলবে না।'

'প্যান্ট?' বঙ্কিম অবাক হল।

'হ্যাঁ যা বলছি ঝটপট করো।'

বঙ্কিম এগিয়ে যেতে দশরথ প্রতিবাদ করল, 'এ কী করতেছ রিপোর্টার? আমি তোমার বাপের বয়সি, আমারে বেইজ্জত করতেছ তুমি?'

'বঙ্কিম!' ধমক দিল বাসুদেব।

বাধা দেওয়ার কোনও উপায় নেই। হাত পেছন মুড়ে বাঁধা, পা-ও। শরীরটা নড়ছে না।

'খুলেছি।' বঙ্কিম মিনমিনে গলায় বলল।

'বেশ। এবার চিমটি দিয়ে একটা একটা করে তুলে ওই ফাঁক দিয়ে ভেতরে ছেড়ে দাও।'

সম্ভবত এবার বোধগম্য হল বঙ্কিমের। সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসাহ বেড়ে গেল। চিমটি ঢুকিয়ে একটা টিকটিকি বের করল সে। বেশ বড়সড়। দশরথ তাই দেখে চিৎকার করল, 'মতলবটা কী, ও রিপোর্টার?'

'ঢোকাও।' বাসুদেব গম্ভীর গলায় বলল।

বোতামের জায়গা দিয়ে টিকটিকিটাকে ছেড়ে দিল বঙ্কিম। তারপর দ্বিতীয়টা, এবং বাকিগুলোকে। প্রচণ্ড চিৎকার করতে লাগল দশরথ। বাসুদেব বলল, 'বোতাম আটকে দাও।'

বোতাম আটকে দিতেই আচমকা চুপ করে গেল দশরথ। যেন বোঝার চেষ্টা করল। বাসুদেব দেখল প্যান্টের দুটো পায়ের মধ্যে এখন আলোড়ন চলছে। একবার গোড়ালি আর একবার হাঁটুর ওপর পর্যন্ত। দশরথ দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল। একটা ভয়ংকর আওয়াজ যা শেষপর্যন্ত গোঙানিতে রূপান্তরিত হল। বাসুদেব লক্ষ করল ওর শরীর মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছে। তারপর মুখ হাঁ হয়ে গেল, চোখ বড় হচ্ছে।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি কথাটা বলবে?'

হাঁ মুখ আরও বড় হল, চোখ এবার ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল। যে কোনও মুহূর্তে লোকটা মরে যেতে পারে। সে দ্রুত ছুটে গিয়ে ওর প্যান্টের নীচের বোতাম খুলে দিতে এক এক করে টিকটিকিগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল। বঙ্কিম সেগুলোকে বাক্সবন্দি করার পরেও দশরথ স্বাভাবিক হচ্ছিল না। একটা সময় তার গলা দিয়ে অস্পষ্ট শব্দ বের হল, 'জল জল।'

বঙ্কিম জল এনে দিতে এক ঢোঁকের বেশি খেতে পারল না দশরথ। থাম থেকে ওকে মুক্ত করে চেয়ারে বসানো হল। সমানে হাঁপিয়ে যাচ্ছে সে। ওই বইতে পড়েছিল বাসুদেব, তিন মিনিটের বেশি সহ্য করতে পারেনি কোনও ভিয়েতনামী।

হয় স্বীকার করেছে নয় মারা গিয়েছে। টিকটিকি ঢোকানোর আগে তাদের অন্তর্বাস জোর করে খোলানো হত। কারণ টিকটিকিগুলো বেরুনোর জায়গা না পেয়ে পুরুষাঙ্গর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। দশরথের অন্তর্বাস খোলানো হয়নি। তা সত্ত্বেও আর এক মিনিট ওই অবস্থায় থাকলে বাঁচানো যেত না।

একটু সুস্থ হওয়ামাত্র বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন। আপনার ছেলে কোথায় আছে?' ইচ্ছে করেই সে আবার আপনিতে ফিরে গেল অথবা সে নিষ্ঠুরতার অভিনয় করতে পারছিল না।

দশরথ মাথা নাড়ল, জানি না।

প্রচণ্ড হতাশ হল বাসুদেব। স্রেফ ভয় দেখানোর জন্যে বলল, 'আপনার সামনের বাক্সটাকে দেখুন। দেখছেন? আবার ওগুলোকে প্যান্টের ভেতরে ঢোকাব?'

'নাঃ।' তীব্র চিৎকার ছিটকে বের হল দশরথের গলা থেকে।

'তা হলে বলুন।'

মাথা নাড়ল দশরথ, 'কোথায় আছে জানি না। নম্বর জানি।'

'নম্বরই বলুন।'

মনে করে করে টেলিফোন নাম্বার বলল দশরথ। ওটা শুনেই সে বুঝল ভারতবর্ষের নাম্বার নয়। যে নাম্বার দশরথের মোবাইলে টিপতেই ওটা জানাল নাম্বার ভুল হয়েছে। বাসুদেব ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস আপনার এখনও গেল না। শেষ সুযোগ দিচ্ছি, ঠিকঠাক নাম্বার বলুন। নইলে টিকটিকি ঢুকিয়ে মেরে ফেলব। এখানে পুঁতে রাখলে কেউ কোনওদিন জানতে পারবে না। বলুন। লাস্ট চান্স!'

এবার মনে করার চেষ্টা করল দশরথ। তারপর বলল, 'প্রথমে এইট এইট জিরো. তারপর এইট টু ওয়ান তারপর এই নম্বর।'

বাসুদেব অবাক হয়ে গেল। প্রথমটা বাংলাদেশের, দ্বিতীয়টা সিলেটের। সে নাম্বারগুলো টিপতেই ওপাশে রিং শুরু হল। তিন-চারবারের পর একটি পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল, 'কী ব্যাপার?' লাইনটা কেটে দিয়ে মোবাইল বন্ধ করে দিল বাসুদেব। অর্থাৎ একটু আগে যে কণ্ঠ শোনা গেল সেটি বিশ্বজিত দেববর্মার। অসময়ে সে তার বাবা দশরথ দেববর্মার ফোন দেখে বিরক্ত হয়েছে। তারপরেই মনে হল সে মোবাইলের লাইন কেটে দিয়েছে বলে বিশ্বজিত ফোন করবে না তো! কেন তার বাবা ফোন করল তা জানতে চাইতে পারে। মোবাইলটা আবার চালু করে সে দশরথকে বলল, 'আপনার ছেলে ফোন করতে পারে। যদি করে তা হলে বলবেন, শরীর খারাপ লাগছিল বলে ফোন করেছিলেন।'

'আমি তো ফোন করি নাই রিপোর্টার।'

'আবার চালাকি করার চেষ্টা করছ? তুমি যে এখানে আমার সঙ্গে আছ তা ওকে বলবে না। বললে আবার টিকটিকি ঢোকাব।' বাসুদেব কথা শেষ করামাত্র রিং শুরু হল। তিনবার বাজার পর সে সেলফোনটা দশরথের হাতে দিল। দশরথ ওটাকে অন করে বলল, 'অ। শরীরটা ভাল নাই। তাই ভাবলাম—!' কথা থামিয়ে কিছু শুনল দশরথ। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কইলাম তো, ঠিক আছে!' তারপর

বোতাম টিপে অফ করে দিল সেটটা। ওর হাত থেকে সেলফোন নিয়ে বাসুদেব বলল, 'তা হলে দশরথবাবু, আপনাকে এখানেই থাকতে হচ্ছে। যতক্ষণ না আপনার ছেলের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে ততক্ষণ আপনাকে এখানে থাকতে হবে। চারবেলা খাবার খাবেন। পালাবার চেষ্টা করবেন না। করলে আবার বিপদে পড়বেন। আমার কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?'

'সে আবার কী! আমারে আটকাইয়া তোমার লাভ কী? নম্বর চাইতেছিলা দিয়া দিছি। ওর সাথে এখনই কথা কও। তবে আমি কইলে সে রাজি হইত, তোমার কথা সে মানবে না।' দশরথ মাথা নাড়ল।

'মানে কি না আমি বুঝব।'

বাইরে বেরিয়ে এল বাসুদেব। বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করল, 'ওর ছেলের কাছে ডাক্তারদাদা আছে?'

'মনে হচ্ছে। এখন কাউকে কিছু বোলো না।'

'না সাহেব। মরে গেলেও বলব না। আমি তা হলে এখানে থেকে যাই।'

'তুমি থাকবে?'

'হ্যাঁ। বুড়োটাকে পাহারা দেব। আপনি চিন্তা করবেন না। শুধু বাসায় একটা খবর দিয়ে দেবেন আর খাবারের জন্যে টাকা লাগবে।' বঙ্কিম বেশ উত্তেজিত।

পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বেব করে বাসুদেব বঙ্কিমের হাতে দিল, 'তোমার জিম্মায় রইল। ও যদি পালায় তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, ডাক্তারকে আর ফেরত পাওয়া যাবে না।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সাহেব। হ্যাঁ, আরও কয়েকটা টিকটিকি ধরতে হবে।'

'কেন? ওগুলোই থাক না।'

'না না। আপনি দেখেননি। বেশ কয়েকটার লেজ খসে গিয়েছে।'

বঙ্কিমের কথায় হেসে ফেলল বাসুদেব। সে লক্ষ করেনি। হ্যাঁ, ছেলেবেলায় সে লক্ষ করত একটু খোঁচালেই টিকটিকির লেজ খসে যেত। খসে যাওয়া লেজগুলো কি ওর প্যান্টের তলায় পায়ের সঙ্গে লেগে আছে? কে জানে।

চৌকিদারকে ডেকে সতর্ক করে দিল বাসুদেব। সে যেন বঙ্কিমের কথামতো চলে। চেনা হোক অচেনা হোক কোনও লোক যেন ওপরে না আসে। তারপর গাড়ি নিয়ে সে সোজা চলে এল আগরতলায়।

এখন দুপুর। কিন্তু বাড়িটা যেন নিস্তব্ধ। গাড়ির আওয়াজ এবং তাকে নামতে দেখে প্রথমে নীলা ছুটে এল, 'আশ্চর্য! একটা খবর দেবে তো?'

'কোনও সুযোগ ছিল না।'

'আমরা ভেবে মরি। তারওপর তুমি বাবার রিভলভার নিয়ে গিয়েছ।'

স্ত্রীকে নিয়ে সে বাইরের ঘরে ঢুকে দেখতে পেল এক্স ডি আই জি শ্বশুরকে রিটায়ার্ড সংস্কৃতের মাস্টারের মতো দেখাচ্ছে। রিভলভার বের করে সামনে রাখল সে, 'দেখে নিন। আপনার একটা গুলিও খরচ হয়নি।'

'তা হলে নেওয়ার কী দরকার ছিল?'

'রামকৃষ্ণদেবের বলা থিয়োরি, ফোঁস করিস, কামড়াস না। রিভলভার দেখালেই যদি কাজ হয়ে যায় তা হলে গুলি ছোড়ার কী দরকার। আপনি স্নান করেননি?'

শাশুড়ি এসে দাঁড়িয়েছিলেন, 'ভয়ে কাঁপছি সবাই। ওসব খেয়াল নেই।'

'আমার ব্যাপারে তো আর ভাবনা নেই। যান, স্নান করুন। আমারও খুব খিদে পেয়েছে। নাকি ভয়ের জন্যে বাড়িতে রান্নাই হয়নি!' বাসুদেব স্ত্রীর দিকে তাকাল।

'হয়েছে। তুমি স্নান করে এসো। গা থেকে টকটক গন্ধ ছাড়ছে।' নীলা একটু ঝাঁঝিয়ে কথাগুলো বলল।

স্নান সেরে ওরা যখন খাচ্ছে তখন বাসুদেব দেখল সৌমিত্রর স্ত্রী টেবিলে নেই। ওর কথা জিজ্ঞাসা করতে নীলা বলল, 'মায়েব সঙ্গে পরে খাবে। খেতেই চাইছে না।'

পি. বি. বললেন, 'কোনও খোঁজখবর পেলে?'

'পেয়েছি। তবে আর একটু ভেরিফিকেশন দরকার।'

শ্বশুরমশাই খাওয়া থামিয়ে তাকাতেই ফোন বাজল। নীলা উঠে কর্ডলেস রিসিভারটা অন করে জিজ্ঞাসা করল, 'কে বলছেন?' অপরপক্ষ কিছু বলল এবং তাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল।

বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

'বলল, টাকাটা যেন তাড়াতাড়ি জোগাড় করা হয়। আমরা এককথার মানুষ। ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে এয়ারপোর্টের রাস্তায় একটা পুলিশের জিপে বোমা মারা হবে। খবরটা দিচ্ছি কারণ এতে বুঝবেন আমরা যা বলি তাই করি।' গড়গড় করে বলে গেল নীলা।

বাসুদেব প্রায় দৌড়ে এসে রিসিভারটা নিয়ে শংকর দত্তকে ফোন করল, 'শংকরবাবু, এক্ষুনি অয়্যারলেসে এয়ারপোর্টের রাস্তায় যত পুলিশের জিপ রাউন্ড দিচ্ছে তাদের সতর্ক করে দিন, কারণ পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হবে। না, না। কথা বলবেন না প্লিজ।' বলে লাইনটা কেটে দিল বাসুদেব।

'শংকর তোমার গলা চেনে?' পি বি জিজ্ঞাসা করলেন।

'বোধহয়।'

'উত্তেজনায় নিজের নাম বলতে ভুলে গেলে। অবশ্য আমার মনে হয় এটা নিছকই হুমকি। এয়ারপোর্টের রাস্তা ওয়েল প্রটেকটেড।' পি বি খাওয়া শুরু করলেন।

শাশুড়ি বললেন, 'এত শাসাচ্ছে যখন তখন টাকার জোগাড় না হলে বিপদ।'

'না। আমি তো বলেছি, এদের টাকা দেবেন না। ভয় দেখিয়েও যখন ওরা টাকা পাবে না তখন এই কিডন্যাপের লাইন ছেড়ে দেবে।' বাসুদেব বলল।

নীলা মাথা নাড়ল, 'তুমি যেটা বলছ সেটা যদি সবাই অনুসরণ করে তা হলে হয়তো হবে। কিন্তু তার আগে আরও ভয় দেখাতে ওরা খুন করবে।'

সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ির কান্না বেড়ে গেল।

এইসময় আবার ফোন বাজল। বাসুদেব রিসিভার অন করতেই শংকর দত্তের গলা শুনতে পেল। উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনি খবরটা কোথায় পেলেন?'

'উড়ো ফোনে হুমকি দিয়েছে একটু আগে। কেন?'

'ওরা বোমা মেরে একটা জিপ ঘায়েল করেছে। আপনার কাছ থেকে খবর পেয়ে

আমি হেডকোয়ার্টার্সে জানিয়ে দিয়েছিলাম অয়্যারলেসে সবাইকে অ্যালার্ট করতে। ওরা সেটা করার আগেই—। তবে কেউ মারা যায়নি, দুজন খুব আহত হয়েছে। আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি।'

'আমি যে এই নাম্বারে আছি তা কী করে বুঝলেন?' বাসুদেব প্রশ্ন করল।

'আপনার শ্বশুরমশাইয়ের নাম্বার আমার ফোনে দেখতে পেলাম। চলি।'

পি বি বললেন, 'সর্বনাশ।'

রিসিভার অফ করে বাসুদেব বলল, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। এখনও হাতে সময় আছে। ও হ্যাঁ, বঙ্কিমের বাড়িতে একটু খবর দিতে হবে। ও কয়েকটা দিন বাইরে থাকবে।'

পি বি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গেছে?'

'গাবরদিতে। চৌকিদারটার অসুখ। তাই ওকে বললাম কয়েকটা দিন পাহারা দিতে।'

নীলা অবাক, 'ও রাজি হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'বাব্বা। এখানেই রাত্রে থাকতে চায় না যে সে ওই পাণ্ডববর্জিত খামারবাড়িতে একা থাকছে? তুমি কিছু লুকোচ্ছ না তো?' নীলার গলায় সন্দেহ স্পষ্ট।

বাসুদেব শাশুড়ির দিকে তাকাল, 'আপনার মেয়েকে একটু বুঝিয়ে বলুন, এত বেশি সন্দেহ করলে কোনও সম্পর্কই টেকসই হয় না।'

শাশুড়ি বললেন, 'সত্যি তো। নীলা তোর আজকাল খুব মুখ হয়েছে।'

বাসুদেব নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক ঠিক।'

নীলা বলল, 'ঠিক আছে। পরে তোমায় মজা দেখাব।'

পি বি বললেন, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে? কী খবর পেয়েছ?'

'সৌমিত্রকে টাইগাররাই নিয়ে গিয়েছে। ওদের সেক্রেটারি হল বিশ্বজিত দেববর্মা। লোকটা আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে। পুলিশ যে ওর হদিশ পাচ্ছে না তা আপনি জানেন। এই লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারলেই যে সমস্যা সমাধানের দিকে এগোবে এমন বিশ্বাস আমার আছে।' বাসুদেব খাওয়া শেষ করল।

বিশ্রাম নেওয়ার নাম করে সে আলাদা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম আসছে না। কাল রাত্রে মাটিতে শুয়েও সে জেগে কাটায়নি। কিন্তু আজ হয়তো জাগতে হবে। একটা বিরাট ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে সে। কিন্তু এটা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই। এই বাড়ি থেকে পঁচিশ লাখ টাকা বেরিয়ে গেলে যে দুর্দশা হবে তা সে মানতে চাইছে না। তা ছাড়া টাকাটা দিলেই তো সৌমিত্রকে পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। সে কথা দিয়েছে পি বি-কে, শেষ চেষ্টা তাকে করতেই হবে। এখন যদি থেমে যায় তা হলে আর একটা বিপদে পড়তে হবে। তার পক্ষে দশরথকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু টাকা দিলে সেটা করতেই হবে। আর ছাড়া পেলে দশরথ যে ভয়ংকর হয়ে যাবে তার জন্যে কোনও অনুমানের দরকার নেই। সে খুনি নয় যে দশরথকে মেরে ফেলবে। পুলিশকে বললেও কোনও লাভ হবে না। ওর বিরুদ্ধে মামলা করার মতো কোনও তথ্য পুলিশ খুঁজে পাবে না।

অতএব তাকেই যা করার করতে হবে। সবার আগে দরকার শাজাহানকে খুঁজে বের করা। ও এখন আগরতলায় আছে কিনা সন্দেহ।

চারটে নাগাদ একটু 'ঘুরে আসি' বলে বের হল বাসুদেব। কলেজপাড়ায় একটা রঙের দোকান আছে শাজাহানের ভাই ফারুকের। সোজা চলে এল বাসুদেব সেখানে। ফারুক দোকানে ছিল। শাজাহান আর বাসুদেব একসঙ্গে স্কুলে পড়ত এ কথা ফারুক জানে। ওকে দেখে খাতির করল। 'আরে, আসেন আসেন! খবর কী?'

'এই চলে যাচ্ছে!' বাসুদেব হাসল, 'তোমার দাদা কোথায়?'

'সিনেমায় গেছে।' ফারুক হাসল।

'সিনেমা? কোন সিনেমা?'

'আপনার খুউব দরকার? বলেন, খবর দিতেছি।'

'খবর দেবে মানে? সে তো সিনেমা হলে।'

'এর আগে দুবার দেখছে। দাদার তো একটাই নেশা।' একজনকে সে পাঠিয়ে দিল শাজাহানের খোঁজে। তারপর চা আনাল।

'শুনছেন?'

'কী?'

'পুলিশের জিপে বোমা পড়ছে। এই ব্যাপারটা আগরতলায় শুরু হইয়া গেল।'

'সেটা বলা যায় না। বিক্ষিপ্ত ঘটনাও হতে পারে।'

'আপনি খবরটা রেডিয়ো টিভিতে দিবেন না?'

'দেখি।' চা খাওয়া শেষ হতেই শাজাহান চলে এল একগাল পান মুখে নিয়ে, আরে বাসুদেব! কী খবর?'

'জরুরি কথা আছে।'

'বল।'

'একটু—!' বলামাত্র শাজাহান ওকে নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে এল। বাসুদেব বলল, 'আমাকে বাংলাদেশ যেতে হবে। আজই। তুই ব্যবস্থা করে দে।'

ভোর হওয়ার আগেই যতটা দ্রুত যাওয়া যায় ততটা দ্রুত হেঁটে যারা সৌমিত্রকে নিয়ে একটা পাহাড়ি পথে চলে এল তাদের প্রত্যেকের মুখ ওর কাছে নতুন। জেস্টার দলে নেই। তার লিখে দেওয়া ওষুধগুলো কখন পাওয়া যাবে, আদৌ যাবে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। সে বলল, 'একটু জল খাব। গলা শুকিয়ে গিয়েছে।'

'একটু দাঁড়ান; জল খাওয়াব।' একজন যুবক যে তার পাশে ছিল জবাব দিল।

'তুমি তো ভাই অন্যদের মতো কথা বলছ না?' সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল।

'মাতৃভাষা বলতে পারব না কেন? তবে আমি যেমন আপনার বাংলা জানি তেমনই অহমিয়া, নেপালিও বলতে পারি।' ছেলেটি হাসল।

ওরা এখন পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে ঘন জঙ্গলের আড়াল।

'মনে হচ্ছে তুমি পড়াশুনা করেছ। চাকরি করনি কেন?'

'চাকরি মানে পরের গোলামি। সেটা করতে হলে স্বাধীন দেশের গোলাম হব।'

'তার মানে? ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ নয়?'

'আপনাদের জন্যে স্বাধীন। আমাদের জন্যে নয়। ভারতবর্ষ ভয় দেখিয়ে আমাদের রাজার হাত থেকে দেশটাকে নিয়ে নিয়েছে। পাকিস্তানিরা আপনাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল আর ভারত সরকার আপনাদের আমাদের বুকের ওপর জোর করে বসিয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরাকে স্বাধীন না করা পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাব।' ছেলেটি বলল।

'কিন্তু তোমরা কী করে তা পারবে? ভারতীয় মিলিটারির সঙ্গে লড়াই করতে পারবে তোমরা? ওদের অস্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে?'

'পারব। আর তার জন্যে টাকা দরকার। যেমন করে আলফা বোরোরা অস্ত্র কিনছে আমরাও কিনব। এই দেখুন। এটার নাম এ কে ফিফটি সিক্স। কী হালকা। অথচ দারুণ অস্ত্র। আপনাদের পুলিশ এসব জিনিস চোখেও দেখেনি। আপনার বিনিময়ে আমরা যে টাকা পাব তা দিয়ে কত অস্ত্র কেনা যাবে ভাবুন তো!' ছেলেটি বেশ উত্তেজিত। তার সঙ্গীরা ইশারা করল বেশি কথা না বলতে। ইশারা দেখে সে চট করে সরে গেল সৌমিত্রর পাশ থেকে।

যেন কোনও সংকেতের জন্যে ওরা অপেক্ষা করছিল। অদ্ভুত এক পাখির ডাক শুরু হতেই ওরা হাঁটতে লাগল। শেষপর্যন্ত পাহাড়ি পথ ডিঙিয়ে একটা ঝরনার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ছেলেটি বলল, 'নিন, যত ইচ্ছে জল খান।'

এসব পাহাড়ি ঝরনার জল খাওয়া খুব বিপদজনক। জন্ডিস তো হতেই পারে, বিকোলাই হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তাকে জল না খেতে দেখে ছেলেটি বলল, 'কী হল? ঝরনার জল, খান।'

'নাঃ। টিউবওয়েলের জল পেলে খাব।'

'ও হো। আপনি ডাক্তার, মনে ছিল না।'

শেষপর্যন্ত ওরা পাহাড়ের খাঁজে এক অস্থায়ী আস্তানায় এসে পৌঁছোল। আস্তানাটা অস্থায়ী বোঝা গেল তার কারণ মাথার ওপর টিনের ছাদ, দুপাশে ত্রিপল, সামনেটা খোলা, পর পর চারখানা ঘরের মতো মাথা গোঁজার জায়গা। সবচেয়ে যেটা বড় সেখানে তাকে ওঠানো হল। তারপর একজন এসে একটা শেকলের মুখের রিং চাবি দিয়ে খুলে সৌমিত্রর পায়ে পরিয়ে দিল। শেকলের অন্য প্রান্তটা একটা হুকের সঙ্গে আটকানো। হুকটা পাথরের মধ্যে ঢোকানো। টেনেও খোলা সম্ভব নয়। সৌমিত্র প্রতিবাদ করল, 'এ কী ব্যাপার? হঠাৎ আমার পায়ে শিকল কেন?'

ছেলেটি বলল, 'এখানে পাহারা দেওয়ার মতো লোক কম। বেশি লোক তো এখানে নিয়ে আসা যায় না। আপনার হাত বাঁধা হচ্ছে না। যখন পেচ্ছাপ পায়খানা করবেন তখন বললে আমরা শেকল ধরে নিয়ে যাব।'

'যেভাবে কুকুরকে নিয়ে যায়?'

'যেভাবে বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হয়।' ছেলেটি বলল।

'আমার খিদে লেগেছে।'

'পাবেন।'

'তোমার খিদে পায়নি।'

'আপনাকে তো বলেছি দেশের জন্য খিদে তেষ্টাকে আমল দিই না।'

'সাবাস।'

'ঠাট্টা করছেন? আপনাদের সুভাষ বোস, ভগৎ সিং করেননি? ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন করেননি? তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি ঠাট্টা করতে পারতেন।'

হতভম্ব হয়ে গেল সৌমিত্র। বলল, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওঁদের তুমি বেশ শ্রদ্ধা কর। ওঁদের সম্পর্কে জান।'

'নিশ্চয়ই করি। আমি চে গুয়েভারাকে শ্রদ্ধা করি, মাও সে তুং, হো চি মিনকে করি। এঁরা সবাই দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করি, আমরাও পারব।' কথাগুলো বলে ছেলেটি চলে গেল। শরীরে ক্লান্তি প্রচুর তবু হাঁ হয়ে বসে রইল সৌমিত্র। এই ছেলেটি যে বিশ্বাস নিয়ে টাইগারের সদস্য হয়েছে সেই বিশ্বাসের কথা সে আগরতলায় বসে জানত না। এরা উগ্রপন্থী, ভারতবর্ষকে টুকরো করতে চায়, এটাই তার ধারণায় ছিল। কিন্তু জঙ্গলে জঙ্গলে রোদ ঝড় জল মাথায় করে প্রচণ্ড কষ্ট মেনে নিয়ে যারা দিনের পর দিন পড়ে আছে একটি শপথ নিয়ে, তাদের আদর্শের কথা কখনওই প্রচারিত হয়নি। হয়তো এই আদর্শ ভুল, এদের ভুল পথে চালানো হচ্ছে। কিন্তু এই ছেলেটি যেভাবে চে গুয়েভারা বা হো চি মিনের সঙ্গে ক্ষুদিরামের নাম উচ্চারণ করে গেল তাতে একে কী করে উপেক্ষা করে যায়!

গোনাগুনতি চারজন। বাকি তিনজনকে কথা বলতে দেখেনি সে। যা বলার বলছে ছেলেটি। সে ফিরে এল জল আর রুটি তরকারি নিয়ে।

'কী আশ্চর্য! এখানে রুটি পেলে কোথায়?'

'ক্যাম্প থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'ক্যাম্প?'

'সেটা আপনার না জানলেও চলবে।'

'তোমার নাম কী ভাই?'

'সৈনিক।'

'অর্থাৎ তুমি তোমার নাম বলবে না।'

'স্বাধীনতা পেলে নিশ্চয়ই বলব।'

'তোমার বাড়ির লোকজন, তোমার মা—?'

'জন্মভূমি আমার মা। সেই মা যখন বন্দিনী তখন আমি আর কোনও সম্পর্কের বাঁধনে থাকতে রাজি নই। খেয়ে নিন।'

রুটিগুলো প্রায় চামড়ার পর্যায়ে চলে গেছে। টেনেও ছেঁড়া মুশকিল। ছেলেটা সেটা লক্ষ করে বলল, 'দেখছি, রাত্রে ভাত পাওয়া যায় কিনা। ক্যাম্পে নিশ্চয়ই ভাত হয়, তবে অনেকটা দূরে।'

'আচ্ছা, বলো তো, আমি কী অন্যায় করেছি?' সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল।

'জন্মসূত্রে আপনি বাঙালি আর আপনার টাকা আছে।'

'আমার চেয়ে অনেকগুণ বেশি টাকা মাড়োয়ারিদের আছে।'

'তারাও আমাদের দিচ্ছে। আপনাদের মতো তারা নয়। জোর করতে হচ্ছে না।'

সৌমিত্র হতবাক। আগরতলার মাড়োয়ারি ব্যবসাদাররা কখনওই স্বীকার করবেন না যে তাঁরা গোপনে উগ্রপন্থীদের টাকা দিচ্ছেন! অবশ্য একজন ধনী ব্যবসাদার নির্বাচনের আগে কংগ্রেসকে যেমন টাকা দেন সি পি এমকেও দিয়ে থাকেন। এদের ক্ষেত্রে না বলার তো কোনও কারণ নেই।

খাওয়া শেষ হল। সৌমিত্র বলল, 'আমি স্নান করতে চাই।'

'অসম্ভব। এখানে জল নেই। জল অনেক দূরে।'

'আশ্চর্য! আমার জন্য তোমরা পঁচিশ লাখ টাকা পাবে আর আমাকে মাত্র একবার স্নান করতে দেবে না? আমার শরীর থেকে গন্ধ বের হচ্ছে।'

'আপনি জামাপ্যান্ট খুলে ফেলুন না। ওগুলো পরে থাকার তো কোনও দরকার নেই। খুলে দিন, আমি ওগুলোকে ধুয়ে আনার ব্যবস্থা করছি।' ছেলেটি হাসল।

সৌমিত্র আর দ্বিধা করল না। শার্ট খুলল। প্যান্ট খুলতেই দেখা গেল সেটি চেনের কারণে শরীরমুক্ত হচ্ছে না। ছেলেটি চাবি ঘুরিয়ে রিং খুলে দেওয়ার পর প্যান্ট বেরিয়ে এল। আবার রিং পরিয়ে দিল ছেলেটি। এখন একটিমাত্র অন্তর্বাস পরে বসে আছে সৌমিত্র। এভাবে থাকার কথা সে কল্পনা করেনি কখনও। কিন্তু টোকো গন্ধটা আর নাকে লাগছে না।

ছেলেটা চলে গেল জামাপ্যান্ট নিয়ে। এখন সমস্ত শরীরে হাওয়া লাগছে। সে ভাবল, সাঁতারুরা তো জাঙিয়া পরেই থাকে। স্টার টিভিতে বে-ওয়াচ নামে একটা সিরিয়াল হত যেখানে মেয়েরা বিকিনি আর ছেলেরা প্রায় জাঙিয়া পরে রোদ পোয়াত। এই পাহাড়ি জঙ্গুলে পরিবেশে কে তাকে দেখতে আসছে যে সে লজ্জিত হবে। টাইগারদের দলে মেয়েরা আছে কিনা সৌমিত্র জানে না তবে তাদের কাউকে সে এখন পর্যন্ত দেখেনি। এক, যে মহিলা তাকে খাবার দিতে আসত সেই মহিলা যদি টাইগার না হয়!

ঘুমিয়ে পড়েছিল সৌমিত্র। ঘুম যখন ভাঙল তখন সূর্যদেব বিদায় নিতে চলেছেন। সে দেখতে পেল খানিকটা তফাতে দুজন পাহারাদার গালে হাত রেখে দাবা খেলছে। কাগজের বোর্ড, প্লাস্টিকের ঘুটি। ওরা তাকে লক্ষই করছে না, ভাবখানা এমন, চেনে বাঁধা আছে, পালাবে কোথায়?

সন্ধে এল। এবং তখনই সেই ছেলেটা ফিরে এল। ওর হাতে দুটো বড় টিফিন ক্যারিয়ার। বলল, 'আলো জ্বালা যাবে না। চটপট রাতের খাবার খেয়ে নিন।'

একটা টিফিন ক্যারিয়ার সে অন্য দুজনকে দিয়ে দিতেই তারা দাবা ভুলে খেতে বসে গেল। দ্বিতীয়টা সৌমিত্রর সঙ্গে ভাগ করে নিল ছেলেটি। ভাত আর ডিমের ঝোল। ঝোলের পরিমাণ প্রচুর।

খেতে গিয়েও থেমে গেল সৌমিত্র। ছেলেটি তার ভাতের চুড়োয় ডিমটাকে রেখেছে। তারপর ঝোল ঢালল। নীচ থেকে সেই নেমে আসা ঝোল দিয়ে ভাত মাখল ছেলেটি। দক্ষ হাতে ঝোল দিয়ে প্রায় পুরো ভাত খাওয়ার পর ডিমটাকে

মুখে পুরে দিয়ে সে চোখ বন্ধ করে চিবোতে লাগল। মনে হচ্ছিল, পরম তৃপ্তি পাচ্ছে সে। অতএব খাওয়া শুরু করল সৌমিত্র। খাওয়ার পর জল খেতেই মনে হল প্রকৃতি ডাকছে। সে কথাটা বলতেই ছেলেটি হুকের কাছে নিয়ে গিয়ে চাবি দিয়ে শেকল খুলে তাকে নিয়ে গেল জঙ্গলে। যেভাবে কুকুরকে শৌখিন বাবুরা পার্কে বা রাস্তায় মলবিয়োগ করায় ঠিক তেমনই চেন ধরে রইল সে।

হালকা হয়ে ফিরে এসে সৌমিত্র বলল, 'তোমার স্বপ্ন যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন অবশ্যই আজকের কথাটা বলবে। আমার কথা।'

সন্ধে নামলেই সব অন্ধকার। ওরা শোওয়ার ব্যবস্থা করছিল। ছেলেটি তার পাশে শুয়ে পড়ল। শোওয়ার আগে সৌমিত্র বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলব?'

'নিশ্চয়ই। বলুন।'

'তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়ছ, কিন্তু লড়বে কী করে?'

'কেন?'

'তার আগেই তো ম্যালেরিয়ায় মরবে। জঙ্গলের মধ্যে এরকম খোলা ঘরে শুলে পাহাড়ি মশা কামড়াবে। নির্ঘাত ম্যালেরিয়া।'

'আপনার পায়ের কাছে মোটা চাদর আছে। টেনে নিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন, মশা হুল ফোটাতে পারবে না।' ছেলেটি বলল।

'গরম হবে না?'

'না। এখানে একটু রাত হলেই ঠান্ডা পড়ে।'

'এটা কোন জায়গা? অবশ্য বলতে আপত্তি থাকলে বোলো না।'

'আপনি যেহেতু খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছেন তাই বলতে আপত্তি নেই। আমরা এখন বাংলাদেশে আছি।'

'কী বললে? সত্যি? আমরা বাংলাদেশে আছি?'

'হ্যাঁ।'

'পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই বাংলাদেশ?'

'ওসব নেই বলে রাত্রে আলো জ্বালা নিষেধ।'

কখন কেমন করে বাংলাদেশে ঢুকে গিয়েছে তা নিশ্চয়ই জানে না সে। ওরা মাঝে মাঝেই সতর্ক হত, অপেক্ষা করে তবে এগোত। আন্তর্জাতিক সীমারেখা পার হওয়ার সময় সেরকমই কিছু করেছিল হয়তো যা সে টের পায়নি। কিন্তু বাংলাদেশে এসে কি ওরা নিরাপদ? বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্ক খুব ভাল। বাংলাদেশের মানুষ কখনওই এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করবে না। তা হলে এখানে ওরা অস্থায়ী ক্যাম্প করল কী করে? ছেলেটির কথা ঠিক হলে কাছাকাছি কোথাও বড় ক্যাম্প আছে ওদের।

সৌমিত্র অসাড় হয়ে গেল। ওকে ওরা ভারতবর্ষের বাইরে নিয়ে এসেছে যখন তখন আর কোনও পথ খোলা নেই। একটু আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল বাসুদেব তার মুক্তির জন্যে কিছু করবে। জেস্টারের মুখে বাসুদেবের কথা শোনার পর তার আশা হয়েছিল পুজোর আগেই সে আগরতলায় ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু এই বাংলাদেশে বাসুদেবের কোনও ক্ষমতা নেই।

সৌমিত্র মনে মনে খুবই মুষড়ে পড়ল।

'শুয়ে পড়ুন।' ছেলেটি বলল।

'কেন? মাঝরাতে উঠে আবার হাঁটতে হবে নাকি?' সৌমিত্র জানতে চাইল।

'না। আপনাকে আর হাঁটতে হবে না। কাল যত বেলা পর্যন্ত ইচ্ছে ঘুমাতে পারেন। কিন্তু এখন আর কথা বলবেন না।' ছেলেটি বলল।

'তুমি কখনও কলকাতায় গিয়েছ?'

'না।'

'গেলে দেখতে, কলকাতা সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষের জন্যে।' সৌমিত্র বলল।

'তাতে কী প্রমাণ হচ্ছে?'

'ভারতবর্ষের মানুষ দেশের যে কোনও জায়গায় গিয়ে মিলেমিশে থাকতে পারে। তোমাদের অনেকেই এখন কলকাতা-বোম্বাই-দিল্লিতে বাড়িঘর করে আছেন। শুধু ত্রিপুরার মানুষ না ভেবে যদি নিজেকে ভারতবর্ষের মানুষ বলে ভাব দেখবে আর কোনও সমস্যা থাকছে না।' সৌমিত্র বলল।

'অক্ষমেরা সবসময় একটা অজুহাত আঁকড়ে ধরে। কলকাতার মানুষদের মেরুদণ্ড নেই, আদর্শ বলে কিছু নেই। তারা তাদের জন্মভূমিকে মা বলে ভাবতেই পারে না। যে যেমনভাবে পারছে তাদের জায়গায় গিয়ে ভোগ করছে। আচ্ছা, কলকাতার সবচেয়ে ধনী লোক কি বাঙালি?' ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল।

'না।'

'তা হলে? যান না মণিপুরে, মেঘালয়ে, অরুণাচলে। গিয়ে বলুন এটা ভারতবর্ষ, এখানে বাড়িঘর করে থাকব। থাকতে পারবেন? ওই তো, নেপালিরা আন্দোলন করল দার্জিলিং ওদের দেশ, ওদের চাই। বাঙালি সরকার ভয়ে ভয়ে দিয়ে দিল। দেয়নি?'

'তুমি ভুল করছ। গোর্খাল্যান্ড ওরা পায়নি। ওদের স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছে।'

'তার মানে সুভাষ ঘিসিং একজন মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। তাই বলছেন?'

'না, তাও নয়, তবে—।'

'তিনি যা বলবেন সেখানে তাই আইন। আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকেও তিনি পাত্তা দেন না। আসলে আপনারা, বাঙালিরা এত সুবিধেভোগী জাত যে যেখানে পেরেছেন ঢুকে গিয়েছেন। পাকিস্তানিদের ভয়ে চলে গেছেন আসাম, ত্রিপুরা। গিয়ে বলছেন এটা ভারতবর্ষ, আমার দেশ। আরে পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত যে ছিল পাকিস্তানের নাগরিক সে রাতারাতি ভারতীয় হয়ে যায় কী করে? আপনারা যদি ত্রিপুরা ছেড়ে চলে না যান তা হলে রক্ত ঝরবেই। আর একবার রক্ত ঝরতে যদি দেখে তা হলে বাঙালিরা সবার আগে ভয়ে পালাবে।' ছেলেটি শুয়ে পড়ল। চাদর টেনে নিল শরীরে।

সৌমিত্র অবাক হয়ে শুনছিল ওর কথা। ও কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাগুলো বলল না কেউ ওকে শিখিয়েছে? আবার ওর কথা যে পুরোটাই মিথ্যে

এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ যে ভারতবর্ষের কথা ভেবেছিলেন, কলকাতা তার প্রতীক। কিন্তু বাসুদেবের কাছে সে শুনেছে কলকাতার অনেক বাড়িওয়ালাই ভাড়াটে হিসেবে অবাঙালি পছন্দ করে। কলকাতায় এখন বাঙালি এবং অবাঙালির সংখ্যা কত? কিন্তু সেটা যাই হোক, এই ছেলেটিকে আর অশিক্ষিত বলা যাচ্ছে না। এ টাইগার দলের ওপরতলার নেতাও নয়। এখানেও তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছে, পাহারায় আছে। অথচ ওর ধারণা ওর কাছে পরিষ্কার। জলে জঙ্গলে প্রচণ্ড কষ্ট করছে যে তার স্বপ্ন স্বাধীন ত্রিপুরার মাটিতে দাঁড়ানো। এদের সংখ্যা যদি ক্রমশ বেড়ে যায় তা হলে কোনও মিলিটারির পক্ষে দমন করা সম্ভব নয়। সরকারের একমাত্র স্বস্তির কারণ হল এদের নেতারা। নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে ওরা আন্দোলনের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে যে কোনওদিন। অস্ত্র কেনার নামে যে টাকার ব্যবস্থা হচ্ছে তার হিসেব তো কখনওই কাউকে দিতে হয় না।

শুয়ে পড়ল সৌমিত্র। তার জামাপ্যান্ট এখনও ফেরত পায়নি। দিব্যি গোটা দিন শুধু জাঙিয়া পরে কাটিয়ে দিল সে। নিজেকে এই পরিবেশে খানিকটা আদিম মানুষ বলে মনে হচ্ছে। সে চাদরটা গায়ে টেনে নিল। আগরতলার বাড়িতে কী হচ্ছে এখন? ওরা নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে টাকার জোগাড় করছে। সময়সীমা পেরিয়ে গেলে এরা কি তাকে খুন করবে? আচ্ছা যদি সেরকম সিদ্ধান্ত হয় আর নেতারা যদি এই ছেলেটিকে আদেশ দেয় তাকে মেরে ফেলতে এ কী করবে? সৌমিত্র নিশ্চিত যে ছেলেটি ভাববে আদেশ পালন করা মানেই দেশমায়ের সেবা করা। তার বুক থেকে মোচড়ানো বাতাস বেরিয়ে এল।

কিন্তু বাসুদেব কী করছে? সে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? যতটুকু তাকে সে চেনে এরকম হওয়ার কথা নয়। বাসুদেব রগচটা, গোঁয়ার। জেদের বশে সে যে কাজ করতে পারে তা অন্য কেউ করতে সাহস পাবে না। বিদেশি কোম্পানি তাকে এমনি এমনি পূর্বাঞ্চলের মুখ্য প্রতিনিধি করেনি। কিন্তু এটা যদি বাংলাদেশ হয় তা হলে বাসুদেবের পক্ষে সেটা অনেক দূর। এখানে তার পক্ষে পৌঁছোনো কি সম্ভব?

ভাইয়ের ব্যবসায় শাজাহান কতটা জড়িত তা বাসুদেব জানে না। কিন্তু তার কাছে খবর ছিল বাংলাদেশে ওর অনায়াস যাতায়াত আছে। সে খবর নিয়েছিল, শাজাহান কোনও চোরাচালানের মধ্যে নেই। তার কাজ হল দু'দেশের মানুষদের বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরোতে সাহায্য করা। এটা ঠিকঠাক করার জন্যে যে নেটওয়ার্ক দরকার তা শাজাহানের আছে।

বাসুদেব বুঝেছিল তাকে বাংলাদেশে যদি বৈধ পথে যেতে হয় তা হলে অনেক সময় লেগে যাবে। ভিসার ব্যবস্থা, প্লেনের টিকিট ইত্যাদিতে সময় চলে যাবে অনেক। অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঢোকায় ঝুঁকি বিস্তর কিন্তু এখন এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।

শাজাহান প্রস্তাবটা শোনার পর বলেছিল, 'দ্যাখ বাসু, যেসব লোকের নামের পাশে এ বি সি ডি নেই তাদের নিয়ে কোনও সমস্যা হয় না। এপারের লোক ওপারে গেলেও কেউ চট করে বুঝতে পারে না। কিন্তু তুই হলি নামকরা রিপোর্টার। যে-কোনও মুহূর্তে তুই ধরা পড়ে যাবি।'

'আমাকে ঝুঁকিটা নিতেই হবে।'

'কী এমন দরকার?'

'একটা খবরের সন্ধানে যাচ্ছি।' বাসুদেব বলল।

'তুই ঠিক কোথায় যেতে চাস?'

'আখাউবা রেলওয়ে স্টেশনে।'

'বাংলাদেশের টাকা সঙ্গে আছে?'

'না। যোগাড় করতে হবে।'

'ঠিক আছে! এখন রাত্রে বর্ডার পার হওয়া বেশ ঝামেলার ব্যাপার। বি এস এফ আর বি ডি আর খুব অ্যালার্ট থাকে। গুলি চালায়। সবচেয়ে ভাল সময় ভোরবেলা। তুই রেডি হয়ে ঠিক একটার সময় এখানে চলে আয়। দুটোর আগে রওনা হব।' শাজাহান বলল।

'তুই অত রাত্রে ওই দিকে যাবি কী করে?'

'উগ্রপন্থী?' হাসল শাজাহান, 'আমাকে ওরা কিছু বলে না।'

'কেন?'

'আমার কাছ থেকে ওরা উপকার পায়। তা ছাড়া আমি মুসলমান, তোদের মতো হিন্দু বাঙালি নই।' হাসল শাজাহান, 'এ নিয়ে তুই কিছু ভাবিস না। তুই আমার বন্ধু, দায়িত্ব যখন নিয়েছি তখন তুই নিরাপদ।'

'তোর চার্জ কত?'

'তুই ফিরে আয় তারপর কথা হবে। আর হ্যাঁ, কত টাকা নিয়ে যাবি?'

'হাজার দশেক।'

'বাংলাদেশ-ইন্ডিয়ার টাকার রেট যাই হোক না কেন আমার কাছে নিলে সমান সমান।'

মাথা নেড়ে চলে এসেছিল বাসুদেব।

নীলাকে বলবে কি না স্থির করতে পারছিল না সে। শেষপর্যন্ত ওকে জানাল, 'শোনো আজই কলকাতায় যেতে হচ্ছে। দুদিন বাদে ফিরব।'

'সে কী? এদিকে এই অবস্থা—।' নীলার গলা টেলিফোনেই অসহায় শোনাল।

'এ ব্যাপারেই যাচ্ছি। কলকাতায় ওদের সোর্স আছে। তুমি চিন্তা করো না।'

'কলকাতায় গেলে চিন্তা করব কেন?'

'গুড।'

এসময় কলকাতায় যাওয়ার কোনও ফ্লাইট নেই। অথচ নীলা সেটা একবারও ভাবল না। মাঝে মাঝে বুদ্ধিমতীরাও কীরকম হয়ে যায়। আর হয় বলেই বাঁচোয়া।

ডায়েরি দেখল বাসুদেব। দুটো নাম। আকবর হাফিজ সোনা আর আসরাফুল হক বাদল। এইদুটো মানুষ এখন ঢাকার বেশ সম্মানজনক ব্যক্তি। এঁর

এসেছিলেন প্রায় তিরিশ বছর আগে। মুক্তিযুদ্ধের সময়। দুজনেই বাসুদেবদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেইসময়। তখন ওর বয়স বড়জোর পাঁচ। বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প সে পরে বড় হয়ে শুনেছে। একজন ক্ষুদিরাম বা সূর্য সেন নয়, হাজার হাজার ক্ষুদিরাম এবং সূর্য সেন তখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে খান সেনাদের বিরুদ্ধে। লড়ে জিতেছে। সেসময় অনেকেই চলে এসেছিলেন সীমান্তের এপারে। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁদের মুক্তিযুদ্ধ। বাসুদেবের বাবা এই যুদ্ধের সমর্থক ছিলেন বলে সোনাচাচা আর বাদলচাচা এ বাড়িতে ছিলেন প্রায় দুই মাস। যুদ্ধের পরেও সেই সম্পর্ক শেষ হয়নি। দু-তিন বছর অন্তর ওঁরা এসে বাবার সঙ্গে দেখা করে যেতেন। শেষ এসেছিলেন বছর দশেক আগে। ওঁরা যখনই আসতেন তখন একসঙ্গে আসতেন। বাবা যখন চাকরির সূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে পোস্টেড ছিলেন তখনও এ বাড়িতে আসতে ওঁরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। চব্বিশ বছরের তরুণ বাসুদেবের সঙ্গে ওঁদের ভাব হয়ে গিয়েছিল খুব। পরবর্তীকালে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছে। বাসুদেবের বাবার মৃত্যুর পর আর ওঁরা আসেননি। তবে বাসুদেব শুনেছে বাদলচাচা বাংলাদেশের রাজনীতিতে খুব গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। তার ধারণা একবার গিয়ে ওঁদের কাছে পৌঁছোতে পারলে সাহায্য পাওয়া যাবেই।

অত রাত্রে আগরতলায় আজকাল অটো দূরের কথা রিকশাও পাওয়া যায় না। দশ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে হেঁটে যাওয়া তো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু অন্য কোনও উপায় নেই। বারোটা নাগাদ টেলিফোন এল শাজাহানের, 'তোকে আসতে হবে না, আমি যাচ্ছি।'

স্বস্তি পেল বাসুদেব। অ্যানসারিং মেশিনে একটা মেসেজ এসেছে। বোতাম টিপতেই সে রিয়াং-এর কণ্ঠস্বর শুনল, 'রিপোর্টার, তুমি কাল রাত্রে এসরাইবাজারে দশরথ দেববর্মার বাসায় ছিলা। তারে নিয়া আজ সকালে আগরতলায় আসছ। কিন্তু দশরথ দেববর্মার কোনও খবর তার বাসার লোক পাইতেছে না। সে এখনও এসরাইবাজারে ফেরে নাই। সে কোথায় নিশ্চয়ই তুমি জানো। দশরথকে ফিরত চাই রিপোর্টার।' মেসেজের আসার সময় বিকেল পাঁচটা। অর্থাৎ লোকটাকে ওর গ্রাম থেকে নিয়ে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টাইগারদের কর্তারা জেনে গেছে। টেলিফোনটা সে যদি ধরত তা হলে বলত, দশরথ কাজ শেষ করে দুপুরে বেরিয়ে গেছে। আর জানতে চাইত, একজন সি পি এম গ্রামপঞ্চায়েতের নেতার জন্যে তারা এত উদ্‌বিগ্ন কেন? দশরথ তো টাইগারদের দলে নেই!

কিন্তু ওরা চুপ করে থাকবে না। আবার ফোন করবে। এবং তখনও তাকে না পেলে সন্দেহ বেড়ে যাবে। বাসুদেব অ্যানসারিং মেশিনে রেকর্ড করল, 'আমি জরুরি কাজে কলকাতায় যাচ্ছি। দিন তিনেক পরে ফিরব। আপনার যদি জরুরি কিছু জানানোর থাকে তা হলে বিপ শব্দটি শোনার পর বললে রেকর্ড হয়ে থাকবে।'

ঠিক দুটোর সময় শাজাহান এল। সে একটা জিপ নিয়ে এসেছে। বাইরের ঘরে ঢুকে বলল, 'দেখ বাসু, আমি চাই না তোর কোনও বিপদ হোক। তোর কি না গেলেই নয়? আমি চাইছি তুই—।'

'না শাজাহান। আমাকে যেতেই হবে।' বাসুদেব বলল।

'বেশ। তুই আখাউরা থেকে কোথায় যাবি?'

'ঢাকায়।'

'যখন টিকিট কাটবি তখনই তো কাউন্টারের লোক তোকে সন্দেহ করবে।'

'কেন?'

'ওরা বুঝতে পারে কে বাংলাদেশের মানুষ, কে নয়!'

'কিন্তু আমার যে কালকেই ঢাকায় পৌঁছোনো দরকার।'

'শোন। আখাউরা স্টেশনের বাইরে সালাউদ্দিনের খাবার দোকান আছে। তাকে আমার কথা বলবি। টাকা দিলে সে তোর টিকিট কেটে দেবে।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল শাজাহান, 'এটা রাখ।'

বাসুদেব দেখল কার্ডটা শাজাহানের। তলায় লেখা 'আপনাদের সেবক'।

'তুই আমার সঙ্গে আখাউরা পর্যন্ত যেতে পারবি না?'

'না। একটা বড় পার্টি আসবে পরশু। ওদের নিয়ে আজমীর যেতে হবে।'

'কোত্থেকে আসছে?'

'তুই যেভাবে বাংলাদেশে যাচ্ছিস ওরা সেভাবেই আসছে। আসছে তীর্থ করতে, অন্য উদ্দেশ্যে নয়।'

'ধরা পড়লে কী হবে?'

'ইন্ডিয়ার ভেতরে ঢুকে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। যারা নেহাতই বোকা তারাই ধরা পড়ে। যাক গে, ওঠ, রওনা হওয়া যাক।' শাজাহান উঠে দাঁড়াল।

'তুই বর্ডার অবধি যাবি?'

'হ্যাঁ। টাকা নিবি তো?'

বাসুদেব একশো টাকার বান্ডিলে দশ হাজার শাজাহানকে দিল। এই টাকা হঠাৎ কোনও বিপদআপদের জন্যে তোলা থাকে বাড়িতে। বাংলাদেশের টাকায় দশ হাজারের বান্ডিলটা এগিয়ে দিয়ে শাজাহান বলল, 'হাজারদুয়েক পকেটে রাখ। বাকিটা এমন জায়গায় লুকা যেন কেউ বুঝতে না পারে।'

আখাউরা রোড ধরে আগরতলা থেকে রওনা হল ওরা। আগরতলা শহরের প্রান্তে এসে দেখল পুলিশের দু-দুটো জিপ দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুকধারী সেপাই হাত তুলে গাড়ি থামাতে বলছে। শাজাহান বলল, 'এখানে তো পুলিশ থাকে না। তুই তোর পরিচয় দে।'

জিপ থামতেই বাসুদেব নেমে দাঁড়াল। একজন অফিসার এগিয়ে এসেছিলেন, মুখে টর্চের আলো ফেলতেই তিনি বাসুদেবকে চিনতে পারলেন, 'আরে! আপনি?'

'খবরের জন্যে যাচ্ছি।' বাসুদেব হাসল।

'না গেলেই নয়?'

'কেন?'

'সন্ত্রাসবাদীদের মুখোমুখি হতে পারেন বলে ইনফরমেশন আছে।'

'ভালই তো। টাটকা কিছু জানা যাবে।'

'যান।' অফিসার ফিরে গেলেন।

জিপে ফিরে আসতেই শাজাহান বলল, 'দেখ, তোদের এরা কীরকম খাতির করে!'

'খাতির না আর কিছু। তোকে নিশ্চয়ই চেনে এরা?'

'বিলক্ষণ। দেখতে পায়নি বলে পরে ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে হবে না।'

'মানে?'

'বুঝতেই পারছিস!'

ঠিক ভোরের একটু আগে ওরা যেখানে পৌঁছে গেল সেখানে হাট বসবে আজ। ইতিমধ্যেই অস্থায়ী দোকানগুলোর ঝাঁপ খুলছে। চায়ের দোকানের সামনে এই পাতলা অন্ধকারেও কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে। শাজাহান ওর একপাশে জিপ রেখে বাসুদেবকে নিয়ে এগোল। একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে কিছু পোশাক ভরে নিয়েছিল বাসুদেব। বেশ হালকা।

দ্রুত ওরা মাঠের ভেতর চলে এল। শাজাহান বলল, 'এখান থেকে ঠিক পাঁচ মিনিট হাঁটলে বর্ডার। এপাশে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, ওপাশে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর বর্ডার পাহারা দেওয়ার কথা। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তোকে ওপারে যেতে হবে। তুই এখানে দাঁড়া, আমি আসছি।'

অন্ধকারে একটা বটগাছের নীচে তাকে দাঁড় করিয়ে শাজাহান উধাও হল। একটু একটু করে আকাশ ফরসা হচ্ছে। শাজাহান বলেছিল রাতের চেয়ে ভোরের দিকেই পারাপার সহজ।

'বলেন মিঞা, যাইবেন কোথায়? ঢাকা, চাঁটগা, সিলেট? বেশি না, মাত্র পাঁচশো টাকা।'

মুখ ফিরিয়ে লোকটাকে দেখতে পেল বাসুদেব। পরনে চেক চেক লুঙ্গি আর ফতুয়া। চিবুক থেকে দাড়িটা অনেকখানি নেমেছে। বয়স পঞ্চাশের ওপারে।

'পাঁচশো টাকা?' বাসুদেবের মজা লাগছিল।

'একদম চিপ মিঞা। এরমধ্যে ট্রেনের ভাড়া আছে।'

'ট্রেনের ভাড়া কত?'

'আরে আগে কন যাইবেন কোথায়?'

'ঢাকায়।'

'তাড়াতাড়ি করেন। সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন ছাড়ব আখাউরা স্টেশন থিকা। এরমধ্যে বর্ডার পার, রিকশা, সব ম্যানেজ করতে হইব।'

'তোমার নাম কী?'

'দালাল ফকির আলি বিশ্বাস।'

'বি এস এফ-বি ডি আর কিছু বলবে না?'

'আল্লার কাছে আমার জন্য একটু দোয়া করবেন যেন সবাই ফকিররে ভালবাসে। চলেন, আর কথায় সময় নষ্ট করবেন না।' দালাল ফকির ওর হাত ধরল।

'তুই শালা এখানে!' শাজাহানের গলা শোনা গেল। সে এসেছে পেছন দিক দিয়ে।

'আরে মিঞা, তোমার মুরগি নাকি?'

'হ্যাই, মুখ সামলে কথা বলবি। আমার দোস্ত। ন্যাংটা পাছার দোস্ত।'

'তা হলে আমার টাইম নষ্ট হইল। আচ্ছা, যাই।' লোকটা আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না।

বাসুদেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা চলে গেল?'

'অত্যন্ত বুদ্ধিমান। যেই বুঝেছে একটা পয়সাও পাবে না অমনি কেটে পড়ল। চল।'

মিনিট তিনেক হাঁটার পর শাজাহান বলল, 'বাঁ দিকে দুটো বি এস এফের জোয়ান আছে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। তুই সোজা এগিয়ে যা। এদিকে কোনও বেড়াটেড়া নেই। বি ডি আর দেখলে আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা করবি। ওপারে তোর জন্যে একটা লোক অপেক্ষা করছে। তার নাম দালাল আলাউদ্দিন, সে-ই তোকে অটোতে তুলে দেবে। যা।'

মনে মনে নামদুটো ঝালিয়ে নিল বাসুদেব। আলাউদ্দিন তাকে অটোতে তুলে দেবে আর স্টেশনের বাইরে সালাউদ্দিনের চায়ের দোকান।

এখন আর অন্ধকার নেই। ছায়া ছায়া চারধার। দ্রুত হাঁটল সে। আশেপাশে সীমান্তরক্ষীরা থাকলেও তাদের দেখার কোনও চেষ্টাই করল না। অনেকটা হাঁটার পর কিছু গাছগাছালি নজরে এল। সেদিকে এগিয়ে যেতেই লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা একটি লোক এগিয়ে এল, 'মিঞার পরিচয় কী?'

'শাজাহানের বন্ধু।'

'প্রমাণ?'

পকেট থেকে কার্ডটা বের করে লোকটাকে দেখাল বাসুদেব। দেখে লোকটা মাথা নাড়ল, 'আমার নাম জানা আছে মিঞার?'

'আলাউদ্দিন কি?'

'ও কে! আসেন।'

আলাউদ্দিনের সঙ্গে হাঁটতে লাগল বাসুদেব। এখন রোদ উঠব উঠব করছে। কিছু বাড়িঘর চোখে পড়ল। আলাউদ্দিন বলল, 'দুশো টাকা চাই।'

বিনাবাক্যব্যয়ে টাকাটা ওকে দিল বাসুদেব। একটা অটোরিকশার সামনে এসে আলাউদ্দিন চেঁচাতে লাগল, 'করিম, করিম। হালায় এখনও ঘুমায়!'

একটি মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল, 'করিম! তোর বাপ ডাকতেছে।'

একটু পরে অল্পবয়সি একটি ছেলে প্রায় ঘুমচোখেই বেরিয়ে এল। তার উদ্দেশে কটুক্তি করতে লাগল আলাউদ্দিন। কোনও প্রতিবাদ না করে অটোতে উঠে বসে তিন-চারবারের চেষ্টার পর ইঞ্জিন চালু করল করিম। আলাউদ্দিন বলল

'যান মিঞা, যান।'

'ওকে কত দিতে হবে?' বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

'এই তো,' টাকার নোট দুটো দেখাল সে, 'যান।'

অটো চলল। এবড়োখেবড়ো মাটির পথ দিয়ে দুলতে দুলতে চলল। বাসুদেব বুঝতে পারছিল সে এখন বাংলাদেশে। তার খুব ভাল লাগছিল। অটো পিচের রাস্তায় উঠতেই বি ডি আরের গাড়ি চোখে পড়তে লাগল ঘন ঘন। যে-কোনও একটা গাড়ি যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করে তা হলে নির্ঘাত জেলে যেতে হবে। কিন্তু সেসব কিছুই হল না। ওরা যখন আখাউরা স্টেশনে পৌঁছোল তখন সাতটা বেজে গেছে। চারপাশ ইতিমধ্যেই জমজমাট হওয়ার মুখে। করিমকে ছেড়ে দিয়ে সে এমনভাবে হাঁটতে লাগল যেন এখানে কতবার এসেছে। স্টেশনটার ঠিক উলটোদিকে যে চায়ের দোকানটা তার ওপর সাইনবোর্ড ঝুলছে, 'সালাউদ্দিন কাফে।'

বাসুদেব সোজা ঢুকে পড়ল। দশ-বারোজন খদ্দের এইসময় পরোটা আর মাংস খাচ্ছে। পরিবেশনকারীরা ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে। বসার জায়গা নেই। একটি ছেলেকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'সালাউদ্দিনভাই আছেন?' ছেলেটি হাত তুলে বাইরে দাঁড়ানো একটি লোককে দেখিয়ে দিল। টেরিলিনের শার্ট এবং জিন্‌স পরা লোকটি এই রেস্টুরেন্টের মালিক? বাসুদেব ভেবেছিল আর পাঁচটা সাধারণ চায়ের দোকানের মালিকের মতো পরিশ্রমী কাউকে দেখবে। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি সালাউদ্দিন?'

'জি।'

'আপনার কাছে শাজাহান পাঠিয়েছে।'

'কোন শাজাহান?'

কথা না বলে কার্ডটা বের করে দেখাল সে। সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে সালাউদ্দিন জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন, কী করতে পারি?'

'ঢাকায় যেতে চাই।'

সালাউদ্দিন তাকে ভাল করে দেখল, 'সাতশো টাকা ভাড়া লাগবে।'

'এত?'

'আপনার যা চেহারা তাতে থার্ডক্লাসে গেলে পাবলিক সন্দেহ করবে। এ সি তে যান। ওখানে চেকিং-এ খুব কড়াকড়ি হয় না। বেশি দেরি নেই ট্রেন ছাড়তে।'

চটপট সাতশো টাকা বের করে সালাউদ্দিনের হাতে দিল বাসুদেব। সালাউদ্দিন হাঁক দিল, 'অ্যাই, সাহেবকে বসা। নাস্তা দে।' বলে চলে গেল।

একটা চেয়ার খালি হতেই ছেলেটা ছুটে এল, 'আসেন সাহেব।'

খিদে পাচ্ছিল। কিন্তু এই সাতসকালে পরোটা মাংস খাওয়ার অভ্যেস না থাকায় বাসুদেব শুধু চা বলল। ছেলেটা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'নাস্তা করবেন না?'

'না।' সারারাত জেগে কাটিয়ে মুখ না ধুয়ে যে ওসব খাওয়া যায় না তা আর এই ছেলেটিকে বলে কী লাভ। চা শেষ হতে না-হতেই সালাউদ্দিন ফিরে এল।

ওকে ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'মাঝখানে এসি। এখনই চলে যান। আর হ্যাঁ, যতটা পারবেন ট্রেনে কম কথা বলবেন। নিন টিকিট।'

চায়ের দাম নিল না সালাউদ্দিন। প্ল্যাটফর্মে ঢুকে সে দেখল যাত্রী প্রচুর। এমনি কামরাগুলো ভিড়ে ঠাসা। সে শীততাপনিয়ন্ত্রিত কামরার সামনে গিয়ে চেকারকে টিকিটটা দেখাতেই তিনি চেয়ারকার দেখিয়ে দিলেন। নাম্বার মিলিয়ে জানলার পাশে বসতেই আরাম লাগলেও ভাল ঠান্ডা ভেতরে। সে টিকিটটা দেখল। একশো টাকা বেশি নিয়েছে সালাউদ্দিন। অবশ্য সে-ই যে টাকাটা নিয়েছে একথা বলা যাচ্ছে না। বাঁকা পথে পাওয়া টিকিটের জন্যেও খরচ হতে পারে। এইসময় সালোয়ার কামিজ পরা একজন মেয়ে তার পাশে এসে বসল। বাসুদেব জানলার দিকে তাকাল।

ট্রেন ছাড়ল। এই আখাউরা থেকে ট্রেন বাংলাদেশের তিন প্রান্তে গিয়েছে। চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং সিলেট। বাংলাদেশের তিনটি প্রধান শহর। পকেটে ট্রেনের বৈধ টিকিট আছে। বাংলাদেশের টাকাও যথেষ্ট রয়েছে কিন্তু নেই পাসপোর্ট এবং তাতে ভিসার ছাপ। যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে তা হলে সোজা জেলে যেতে হবে। অন্যায় সে করছে কিন্তু সময় নষ্ট করার সময় তার নেই।

বাসুদেব ছুটন্ত ট্রেনে বসে ঘুমোবার চেষ্টা করল। গোটা রাত জেগে, টেনশন নিয়ে ছুটে আসার জন্যে যা এতক্ষণ বুঝতে পারেনি সেটা জানান দিল। নার্ভগুলো ট্রেনে বসার পর হয়তো আরাম পেয়েছিল, পেতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক বাদে গলার স্বরে ঘুম ভাঙল, 'টিকিট!'

অনেক কষ্টে চোখ মেলল সে। চেকার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চটপট টিকিট বের করে দিল। ভদ্রলোক সেটার ওপর একটা দাগ দিয়ে ওর দিকে তাকালেন, 'ঢাকায় যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'ইন্ডিয়ান।'

মিথ্যে কথা বলতে পারল না বাসুদেব, 'হ্যাঁ।'

'বেড়াতে যাচ্ছেন?'

'না। কাজে।'

'আপনার নামটা—?'

বাসুদেব নাম বলল। ভদ্রলোক আর কিছু না বলে অন্য লোকের টিকিট দেখতে লাগলেন। লোকটি তার সব জিজ্ঞাসা করল কেন? অস্বস্তি হচ্ছিল বাসুদেবের। হঠাৎ পাশের মহিলা কথা বললেন, 'আপনি কলকাতায় গিয়েছেন?'

বলার মধ্যে বাংলাদেশের টান আছে।

বাসুদেব মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। কেন?'

'কলকাতার কথা আমি বইতে পড়েছি। খুব যেতে ইচ্ছে করে।'

আর কথা না বাড়িয়ে চোখ বন্ধ করল সে। যখন ঘুম ভাঙল তখন মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কিছু খাবেন না?'

বাসুদেব টের পেল ট্রেনটা একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। কোন স্টেশন? সেই

গত রাতের পর এক কাপ চা পেটে পড়েছিল সকালে। এখন বেশ খিদে পেয়েছে। সে মাথা নাড়ল। তারপর ওঠার চেষ্টা করল। মেয়েটি বলল, 'এখনই ট্রেন ছেড়ে দেবে। আমার সঙ্গে খাবার আছে, খেতে আপত্তি আছে?'

'আপনার কম পড়ে যাবে না তো?'

'একটুও না।' মেয়েটি তার ব্যাগ থেকে প্যাকেট বের করল, 'কেক আছে। বাড়িতে তৈরি কেক। নিন। সঙ্গে পানি আছে।'

কেকটি বেশ বড়। তার অর্ধেক মেয়েটি তাকে দিল। কামড় দিয়ে বাসুদেব বুঝল কেকটি অতীব সুস্বাদু। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি ঢাকায় যাচ্ছেন?'

'আমাকে তুমি বলুন। হ্যাঁ। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।'

'এই কেক কে বানিয়েছেন?'

'আমি। কেন?'

'খুব ভাল হয়েছে, তাই।'

মেয়েটি খুব খুশি হল। কিন্তু খাওয়ার পর আর কথা বাড়াল না বাসুদেব। চোখ বন্ধ করতেই ঠান্ডা কামরার আরামে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ট্রেন ঢাকায় পৌঁছোতে দুপুর হয়ে গেল। মেয়েটির সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে নেমে বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ধানমন্ডি কত দূর?'

'আপনি ধানমন্ডিতে যাবেন?' মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি এই প্রথম ঢাকায় এলাম। কিছুই চিনি না। বাইরে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। চলুন।' সে পা বাড়াল।

'আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমিও ধানমন্ডিতে যাব। ওখানেই থাকি। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।' মেয়েটি বলল।

স্টেশানের বাইরে এসে একটা স্কুটার ভাড়া করল মেয়েটি। কথাবার্তায় বাসুদেব বুঝল স্কুটারকে এখানে বেবি ট্যাক্সি বলা হয়। স্কুটারে উঠে সে বলল, 'আমার দেখে বেশ ভাল লাগছে। আপনার বয়সি একটি মেয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে একা ট্রেনে চেপে ঢাকায় চলে এলেন। অর্থাৎ এখানে মেয়েদের অবস্থা আর আগের মতো নেই।'

'তা ঠিক নয়। আমার বাবা নেই। মায়ের পক্ষে আসা সম্ভব নয়। তাই একা না এসে কী করি বলুন। আপনি ধানমন্ডির কোথায় যাবেন?'

পকেট থেকে কাগজটা বের করল সে। আসবার আগে বাদলচাচার ঠিকানা সে আলাদা কাগজে লিখে এনেছিল। সেটা শুনে মেয়েটি উত্তেজিত, 'আরে! এটা তো আমাদের পাশের বাড়ি। ওই বাড়িতে আমার ফ্রেন্ড থাকে। ওর নাম ছুটি।'

'ছুটি? বাঃ, কী সুন্দর নাম।'

'আপনি তো আমার নামই জানলেন না!'

'হ্যাঁ। সরি। কী যেন নামটা?'

'লাবণ্য।'

অবাক হয়ে তাকাল বাসুদেব। লাবণ্য হাসল, 'শেষের কবিতার নই কিন্তু।'

'ঠিকই। শেষের কবিতার লাবণ্য এত সাহস পেত না।' বাসুদেব বলল।

ঢাকার রাস্তাঘাট দেখে বেশি অবাক হচ্ছিল বাসুদেব। বেশ চওড়া, বিদেশের সঙ্গে মিল আছে। কলকাতায় এমন রাস্তা নেই। প্রায়ই চাইনিজ রেস্টুরেন্টের নিয়োন সাইন চোখে পড়ছে। চিনে খাবার বোধহয় এখানে বেশ জনপ্রিয়।

'ওই রাস্তায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ি।'

'তাই?' বাসুদেব ঝুঁকে দেখল।

সুন্দর একটি রাস্তায় ঢুকল বেবি ট্যাক্সি। একটি বাড়ির সামনে লাবণ্য তাকে দাঁড় করাল, 'এসে গেছেন। ওটা ছুটির বাড়ি।'

নেমে ভাড়া দিতে গেলে মেয়েটি আপত্তি করল। বাসুদেব তাকে কপট ধমক দিল, 'তুমি বাড়ির কেক খাইয়েছ, এখন একটাও কথা বলবে না।'

ভাড়া মিটিয়ে দিলে লাবণ্য নিজেই এগিয়ে গেল বেল বাজাতে। একবারেই দরজা খুলল একটি ছেলে, 'ও, তুমি। ছুটি বাসায় নাই।'

'ছুটির জন্য আসি নাই। তোমাদের বাসায় একজন মেহমান এসেছেন।' লাবণ্য বলল, 'আসুন!'

বাসুদেব এগিয়ে গেল, 'বাদলচাচা আছেন?'

'আপনার নাম?'

'বাসুদেব।'

'হ্যাঁ, আছেন। কী বলব?'

'বলুন ইন্ডিয়া, আগরতলা থেকে বাসুদেব এসেছে।' শুনে ছেলেটি চলে গেল। এবং তার এক মিনিটের মধ্যেই বাদলচাচার চিৎকার শোনা গেল, 'আরে বাসুদেব! হোয়াট এ সারপ্রাইজ? তুমি ঢাকায়! আসো, আসো, কাম ইন।'

আসরাফুল হক বাদলের চেহারা প্রায় একইরকম রয়ে গেছে। প্রাথমিক অভ্যর্থনার পর তাঁর খেয়াল হল, জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাবণ্য, তুমি এরে পাইলা কোথায়?'

বাসুদেব বলল, 'আমরা এক ট্রেনে এসেছি।'

'ট্রেনে? আখাউরায় তুমি—। আমি কিছুই বুঝতেছি না।'

'আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি।' বাসুদেব হাসল।

লাবণ্য বলল, 'আমি তা হলে যাই।' বাসুদেব মাথা নাড়লে সে চলে গেল।

বাদলচাচা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার লাগেজ ওই একটাই?'

'হ্যাঁ।'

'আসো। ভিতরে আসো।'

আধঘণ্টা পরে স্নান সেরে চা খেতে খেতে বাদলচাচার সঙ্গে কথা বলছিল বাসুদেব। যা যা হয়েছে তার সবই বিস্তারিত বলল সে। সব শোনার পর বাদলচাচা বললেন, 'তোমার ধারণা ওদের নেতা বাংলাদেশের মধ্যে আছে অথচ এখানকার কোনও পেপার খবরটা জানে না।'

'ওর বাবা যে টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিল সেটা ডায়াল আমি নিজে করেছি। লোকটার কথাও শুনেছি। নাম্বারটা বাংলাদেশের।' বাসুদেব বলল।

'ঠিক আছে। চিন্তার কিছু নাই। আইস্যা যখন পড়ছ তখন দেখতেছি কী করা

যায়।'

'আমার হাতে সময় কিন্তু খুব কম।'

'বুঝলাম। তোমার তো পাসপোর্ট ভিসা নাই।'

'নেই।'

'একাত্তর সালে যখন আমরা তোমাদের বাসায় ছিলাম তখন আমাদেরও ছিল না।'

'তখন যুদ্ধ হচ্ছিল। আইনকানুন ছিল না।'

'ঠিক। যদিও তুমি একটা মারাত্মক সমস্যা নিয়ে ঢাকায় আসছ কিন্তু আইনের চোখে তুমি অপরাধী। তাই বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক না।' বাদলচাচা ফোন তুললেন। ডায়াল করে বললেন, 'মিঞা, কী করতেছেন? আরে ওসব ছাড়েন, আমার বাসায় জলদি আসেন। হ্যাঁ, কখনও তো বলি নাই, সারপ্রাইজ দিতে চাই, আসেন।'

ফোন রেখে দিলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, 'তুমি যে নম্বর বললা সেটা যদি ঠিক হয় তা হলে লোকটা আছে সিলেটে। কিন্তু সিলেট তো ছোট গ্রাম না যে গেলেই তারে পাইবা। সোনাভাই আসতেছে, দেখি সে কী বলে।'

আকবর হাফিজ সোনা খুব সিরিয়াস ধরনের মানুষ। বেশ গম্ভীর হয়ে থাকতেন। তুলনায় বাদলচাচা বেশ মজার কথা বলতেন বলে তাঁর ঠিকানা নিয়ে এসেছিল বাসুদেব। আধঘণ্টার মধ্যে সোনাচাচা চলে এলেন। মাথায় টাক পড়েছে, পরনে পাজামা পাঞ্জাবি।

বাদলচাচা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরে চেনেন?'

'না।' মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। তারপর কলকাতার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আপনি?'

'আমি বাসুদেব।'

'বাসু বাসু, আগরতলায় বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'মাই গড। তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ।'

বাদলচাচা বিদেশি কোম্পানির নাম উল্লেখ করে জানাল বাসুদেব ওই কোম্পানির রিপোর্টার।

'আমি তোমার নাম শুনেছি। তবে ভাবতে পারিনি। তোমাকে যখন আমি প্রথম দেখেছিলাম তখন তুমি শিশু। তা ঢাকায় কি বেড়াতে এসেছ?' সোনাচাচা জিজ্ঞাসা করলেন।

বাদলচাচা বাসুদেবের আসার কারণ এবং উদ্দেশ্য ওঁকে বলতে উনি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'এটা যখন সরকারি টেলিফোন তখন লোকেট করতে অসুবিধে হবে না। তুমি তো অনেক দূর থেকে এসেছ, রেস্ট নাও। আমি দেখছি কী করা যায়!'

'আপনি কি পুলিশে খবর দেবেন?' বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

'দিলে পুলিশকে তোমার কথা বলতে হবে। তোমার এই বেআইনিভাবে

আসাটা পুলিশ মেনে নেবে না। তারওপর পুলিশ ওখানে পৌঁছোবার আগেই পাখি উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।'

'তা হলে?'

'দেশ স্বাধীন হয়েছে তিরিশ বছর। কিন্তু আমরা যারা রাজাকার নই, মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়েছিলাম তারা এখনকার অনেক ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই। আমাদের একটা সংগঠন আছে। তিরিশ বছর আগে যাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের অনেকেই এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু আমাদের সংগঠনে অনেক যুবক শামিল হয়েছে যাদের মনে দেশপ্রেম জাগাতে পেরেছি। আমাদের কাজ হল কোথাও কোনও অবিচার হলে তার প্রতিবাদ করা। সরকারের নজরে নিয়ে আসা। তুমি চিন্তা করো না। তোমার বাবার কাছে আমাদের যা ঋণ তা তো কখনই শোধ করতে পারব না। সবাইকে বলি সেইসব দিনের কথা। তিনি শুধু আশ্রয়ই দেননি, নানাভাবে আমাদের সাহায্যও করেছেন। আজ তোমাদের পরিবারের বিপদ। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ সরকার এসব খবর এখনও পাননি। কিছু লোভী বিশ্বাসঘাতক যে কাজটা করতে সাহায্য করছে আমরা তার প্রতিবাদ করব। বাদল, আমি উঠলাম।' সোনাচাচা চলে গেলেন।

আকবর হাফিজ সোনার কথায় মনে জোর পেল বাসুদেব। কিন্তু কীভাবে তিনি কাজটা করবেন তার হদিশ সে পাচ্ছিল না। খাওয়াদাওয়ার পর সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাদলচাচার ডাকে ঘুম ভাঙল। বাদলচাচা বললেন, 'জলদি তৈরি হও, সোনা আসতেছে।' সেই বিকেল থেকে সে একনাগাড়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘড়িতে এখন রাত আড়াইটে। বাসুদেব বলল, 'এখন?'

'ফোন করেছিল।'

ঝটপট তৈরি হয়ে নিল বাসুদেব। বাদলচাচাও জামাপ্যান্ট পরে এলেন। একটু বাদেই বাড়ির সামনে দুটো মাইক্রোবাস এসে দাঁড়াল। এগুলো দেখতে অনেকটা সুমোর মতো, একটু বড়। সোনাচাচা নেমে এলেন প্রথম গাড়ি থেকে। বললেন, 'চলো বাসুদেব, আমরা তৈরি। বাদল, তুমি বাড়িতে থাকো।'

'কীরকম?' বাদলচাচা অখুশি হন।

'ঢাকায় একজনের থাকা দরকার। যদি কোনও সমস্যা হয় তা হলে আমি তোমাকে জানাব। তুমি সঙ্গে সঙ্গে কাকে কী বলতে হবে, কী করতে হবে ঠিক করবে। তোমার বাড়িটাই হবে আমাদের হেড-কোয়ার্টার্স। দুদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ো না।'

'আমার মোবাইল নাম্বার—।'

তাঁকে থামিয়ে দিলেন সোনাচাচা, 'মোবাইলে সবসময় লাইন পাওয়া যায় না। এসো বাসুদেব।'

গাড়ির কাছে গিয়ে বাসুদেব বুঝতে পারল সোনাচাচার সঙ্গে অনেক ছেলে এসেছে। সে প্রশ্ন করতেই জানতে পারল মোট কুড়িজন এসেছে। এরা সবাই খুব ডেডিকেটেড, সাহসীও। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাতের এই সময়ে সোনাচাচা কী করে এত ছেলে জোগাড় করলেন ভাবতেই পারছিল না বাসুদেব। অর্থাৎ

বাদলচাচার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক আর এক মিনিটও বিশ্রাম নেননি।

দুটো গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল রাতের নির্জন রাজপথ দিয়ে। শেষপর্যন্ত শহর পেছনে রেখে যখন হাইওয়ে ধরল তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। মাঝখানে একবার হাইওয়ে পুলিশ গাড়ি থামিয়েছে। সোনাচাচা নেমে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতেই তারা যাওয়ার অনুমতি দিল।

ঘণ্টা ছয়েক যাওয়ার পর গাড়ি থামল রাস্তার পাশে একটা ধাবাজাতীয় খাবারের দোকানের সামনে। বাসুদেব দেখল ছেলেদের সংখ্যা উনিশ। অর্থাৎ সোনাচাচাকে ধরলে কুড়ি। প্রত্যেকেই প্যান্টশার্ট পরা আর ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা বড় গামছা জড়ানো। একটি হাত যেভাবে গামছার তলায় তুলে রেখেছে তাতে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে ওরা প্রত্যেকেই অস্ত্র ধরে আছে। সোনাচাচার নির্দেশে অতি দ্রুত তারা প্রাকৃতিক কাজ শেষ করে খাবার খেয়ে নিল। তারপর আবার গাড়ি ছাড়ল।

বিকেল নাগাদ নদী পার হল ওরা। এপারে এসে সোনাচাচা বললেন, 'এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম। সন্ধের সময় রাস্তায় পুলিশ বেশি সক্রিয় হয়।'

গ্রাম্য চায়ের দোকানে যা পাওয়া যায় তাই খাওয়া হল। দুপুরে এবং এখন বাসুদেব খাবারের দাম দিতে গিয়েছিল কিন্তু সোনাচাচা রাজি হননি। বলেছেন, 'তুমি আমাদের অতিথি। আমরা যখন আগরতলায় গিয়েছিলাম তখন তো তোমরাই খাইয়েছিলে। অতএব চুপ করে থাকো।'

বাসুদেব ভাবছিল সৌমিত্রর কথা। ও এখন কোথায় কীভাবে আছে তা ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু তার মন বলছিল ওকে ফেরত পাওয়া যাবে। যেভাবে বিনা বাধায় পর পর ঘটনাগুলো ঘটছে তাতে এই বিশ্বাসটা আরও জোরালো হচ্ছে। দশরথের গ্রামে যাওয়া, তাকে তুলে এনে বিশ্বজিতের ফোন নাম্বার পাওয়া, প্রায় বিনাবাধায় তার বাংলাদেশে চলে আসা এবং এককথায় সোনাচাচার সাহায্য পাওয়ার পর এই আশা বেড়ে গিয়েছে। সোনাচাচা বলেছেন ওরা যাচ্ছে শ্রীহট্টে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কুদ্দুস আলি নামের এক তরুণ ওঁর সহযোদ্ধা ছিলেন। সেই ভদ্রলোক এখন শ্রীহট্টের এক চা-বাগানের ম্যানেজার। ভদ্রলোক নাকি অনেকবার সোনাচাচাকে নেমন্তন্ন করেছেন যাওয়ার জন্যে, যাওয়া হয়নি। সোনাচাচা তাঁকে কোনও ঘটনা না বলে বিশ্বজিতের টেলিফোন নাম্বার দিয়ে অনুরোধ করেছেন ফোনটা কোথায় তার অনুসন্ধান করতে। বিশ্বজিতকে যদি কোনওভাবে পাওয়া যায়, যদি সে এরমধ্যে অন্য কোথাও চলে না যায় তা হলে সৌমিত্রর মুক্তির সম্ভাবনা থাকছে।

আজ সকালে ছেলেটি সৌমিত্রর পা থেকে চেন খুলে দিল। দুটো পায়ের ক্ষত আরও বেড়েছে। ব্যথা হচ্ছে খুব। একটু একটু রস গড়াচ্ছে। অবিরাম হাঁটা, জুতো ও বালির সংঘর্ষ, তারওপরে লোহার বালা পায়ে ঘষে ঘষে এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে সৌমিত্রর ভয় হচ্ছিল সেপটিক না হয়ে যায়। তবু বালা খোলার পর সে রসিকতা করল। 'খুলে তো দিলে, যদি পালিয়ে যাই?'

ছেলেটি সিরিয়াস গলায় বলল, 'পারবেন না।'

'কেন?'

'প্রথমত, রাস্তা চেনেন না। এখানে কোনও মানুষ নেই যে আপনাকে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, এই পা নিয়ে আপনি বেশি দূর হাঁটতে পারবেন না। তৃতীয়ত, বর্ডার পেরোতে গেলে বি ডি আর আপনাকে গুলি করবে। অতএব মরতে চাইলে ওই চেষ্টা করতে পারেন।'

'তোমরা কী করে পারাপার কর?'

'আমরা রোজ জানতে পারি কোন সময় ওরা কোন জায়গাটা থেকে পাহারা তুলে নেবে।'

'বি ডি আর তোমাদের সাহায্য করছে?'

'বি ডি আর কেন করবে? ওদের কিছু লোক করছে। এই পৃথিবীতে টাকা দিয়ে অনেক কিছু কিনতে পারা যায়।' ছেলেটির মুখ শক্ত হল।

'তোমাদের পারা যায়?'

'দু-একজন হয়তো লোভ সামলাতে পারে না তবে তারা বেশিদিন বেঁচে থাকে না।'

'যাক গে, আমি কিছু ওষুধ লিখে দিয়েছিলাম, সেগুলো পাওয়া যায়নি? আর দেরি করলে হয়তো পা-টাকে বাঁচানো যাবে না।' সৌমিত্র বলল।

'আপনি প্রাণের কথা না ভেবে পায়ের কথা ভাবছেন?'

দুপুরে জেস্টার এল। শুয়েছিল সৌমিত্র। দুটো ছেলে দাবা খেলছিল। জেস্টার বলল, 'নাও ডক্টর ; তোমার ওষুধ।'

উঠে বসল সৌমিত্র। বাক্সটা খুলে দেখল সে যা যা ওষুধ চেয়েছিল তার সবগুলোই আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মলমটা লাগিয়ে দিল দুই পায়ে। তারপর অ্যান্টিবায়োটিক হাতে নিয়ে জলের বোতলটা তুলে নিল। ওষুধ খাওয়া চুপচাপ দেখছিল জেস্টার। তারপর বলল, 'দশরথ দেববর্মার নাম কখনও শুনছ?'

'না। তিনি কে?'

'একটা মানুষ। তারে পাওয়া যাইতেছে না। সেইসঙ্গে তোমার বুনের স্বামী রিপোর্টারও উধাও। তুমি জান কিছু?' জেস্টার প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল সৌমিত্র, 'আমি কী করে জানব? আমাকে তো তোমরাই ধরে রেখেছ।'

'হুঁ। ডক্টর! তোমার উপর কোনও অত্যাচার আমরা করি নাই। কী ঠিক না?'

'না করলে পায়ের এই অবস্থা কেন হবে?' দুটো পা দেখাল সে।

'এইটার পিছনে আমাদের কোনও হাত নাই। তোমার বাপের মতলবটা কী?'

'এসব প্রশ্ন আমাকে কেন করছ? আমার সঙ্গে কি কোনও যোগাযোগ আছে?'

'আছে। আর দুইটা দিন। তার মধ্যে যদি টাকা না দেয় তাইলে বুঝতেই পারতেছ, এখানেই তোমার কবর খুঁড়তে হইব।' জেস্টার চলে গেল।

সৌমিত্র অবাক হচ্ছিল। দশরথ কে? তাকে নিয়ে বাসুদেব কোথায় উধাও হয়েছে? বাবা যে এখনও টাকা দেয়নি এটা বোঝা যাচ্ছে। এদের সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে টাকা দিলে এরা তার ক্ষতি করবে না। কিন্তু এতগুলো টাকা দিয়ে মুক্তি

কিনবে সে? সারা জীবনে কি এই টাকা জমিয়ে ঋণশোধ করতে পারবে?

ছেলেটি এল। একটা হাফপ্যান্ট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা পরে নিন।'

'কেন? এই জাঙিয়ায় বেশ আছি।'

'হঠাৎ?'

'তোমরাই তো আমাকে এই অবস্থায় এনেছ!'

'এখন বলছি এই হাফপ্যান্ট পরে ফেলুন।'

পরল সৌমিত্র। একটু ঢিলে হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'দশরথ দেববর্মা কে?'

'কোন দশরথ দেববর্মা?'

'এই নামে তুমি কাউকে চেন?'

মাথা নাড়ল ছেলেটি। কিন্তু সৌমিত্রর মনে হল ও মিথ্যে বলছে।

'আপনার পা কেমন আছে?'

'খুব খারাপ।'

'আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। মানুষের শরীরে হঠাৎ যে-সমস্ত রোগ হয় তার একটা লিস্ট করবেন, করে সেইসব রোগের জন্যে যে ওষুধ খাওয়া দরকার তা লিখে দেবেন।'

'হঠাৎ?'

'আমাদের সঙ্গে সবসময় ডাক্তার থাকেন না। থাকলেও ইচ্ছে করলেই ওষুধ পাওয়া যায় না। ওগুলো আমরা একটু বেশি পরিমাণেই আনিয়ে রাখতে চাই।'

'তার মানে আমাকে প্রেসক্রিপশন লিখতে হবে। পারিশ্রমিক দেবে তো?'

ছেলেটি হাসল, 'আপনি অদ্ভুত লোক।'

'কীরকম?'

'কত নেবেন? দুশো, তিনশো? নিয়ে খরচ করবেন কোথায়? এমন তো হতে পারে দুদিন বাদে আপনি পৃথিবীতে থাকবেন না। তখন?' ছেলেটি মাথা দোলাল।

'কথাটা মন্দ বলনি। ঠিক আছে দাতব্য করা যাক। কাগজ কলম নিয়ে এসো।' সৌমিত্র বলল। ছেলেটি কিছুক্ষণের মধ্যে কাগজ কলম এনে দিল। সৌমিত্র মনে করে করে যতটা পারে সম্ভাব্য অসুখ এবং তার ওষুধের লিস্ট তৈরি করল। এর অনেকগুলো আগরতলায় ছাড়া ত্রিপুরার অন্য কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা কম। যেসব ওষুধ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না করেও খাওয়া যায় সৌমিত্র সেইসব ওষুধের নাম লিখল। লিস্ট নিয়ে ছেলেটি চলে গেলে সৌমিত্র উঠল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, কটা দিন পাদুটোকে বিশ্রাম দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

কয়েক পা হাঁটতেই সে দেখতে পেল দাবার বোর্ড সাজিয়ে একজন প্রহরী গালে হাত দিয়ে ভাবছে। এই লোকটি পার্বত্য উপজাতী গোষ্ঠীর। অবশ্যই বাংলা জানে না। ওর সঙ্গে বিপ্লবী ছেলেটি কথা বলে যে ভাষায় তা বুঝতে পারেনি সৌমিত্র।

সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে লোকটির উলটোদিকে বসল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখচোখে অস্বস্তি ফুটে উঠল। মুক্ত অবস্থায় সৌমিত্র যেখানে ছিল

সেখানেই থাকলে সে যেন খুশি হত। সৌমিত্র ঝুঁকে বোর্ড দেখল। তারপর দুটো বড়ে এগিয়ে দিয়ে হাসল। লোকটি চারপাশে তাকাল, একটু ভাবল, তারপর প্রথম চাল দিল। সৌমিত্র খানিক বাদেই লক্ষ করল দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে খেলার ধৈর্য লোকটির নেই। ঝটপট আক্রমণ করে শত্রুর শক্তি হ্রাস করাই তার উদ্দেশ্য। ফলে একসময় দু'পক্ষের বল কমতে কমতে তিন তিনে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটির মুখচোখে এখন হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। যেন এই যুদ্ধে তাকে জিততেই হবে। সৌমিত্র এবার ইচ্ছে করে ভুল চাল দিতে লাগল। উল্লসিত লোকটা সহজেই জিতে গিয়ে দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠল। সৌমিত্র চলে আসার জন্যে পা বাড়াতেই লোকটি ওর হাত ধরল। তারপর জোর করে বসিয়ে নতুন করে বোর্ড সাজাতে লাগল। অর্থাৎ ওর সঙ্গে আবার খেলতে হবে। সৌমিত্র এটাই চাইছিল।

দুপুরের খাবার নিয়ে ছেলেটির সঙ্গে এল যে লোকটা তার চালচলন বেশ নেতা গোছের। লোকটি ইংরেজি জানে। সোজা সামনে এসে বলল, 'এটা কী লিখেছ?'

সৌমিত্র দেখল তার লেখা লিস্টটা লোকটার হাতে। বলল, 'যা তোমরা চেয়েছিলে।'

তখন দাবা খেলা বন্ধ। উপজাতীয় লোকটি দূরে বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। নেতা বলল, 'এসব ওষুধ তো বাচ্চা ছেলেও জানে। লাইফসেভিং ওষুধগুলোর নাম লিখে দাও।'

'পেশেন্ট না দেখে কোনও ডাক্তার ওইসব ওষুধ প্রেসক্রাইব করবে না।'

'কোন ডাক্তার কী করে তা আমার জানার দরকার নেই, তুমি লিখবে।'

'অসম্ভব। ডাক্তারি শাস্ত্রবিরোধী কোনও কাজ আমি করতে পারব না।'

'তুমি লিখবে না?'

'নো। নেভার। যে ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে খাওয়া ঠিক নয় তা আমি লিখতে পারি না।' সৌমিত্র কথাগুলো বলামাত্র লোকটি সবেগে চড় মারল। পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল সৌমিত্র। কিন্তু ততক্ষণে লোকটি আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দু'হাতে মারতে মারতে চেঁচাচ্ছে, 'শালা, কুত্তা, বাঙালির বাচ্চা, তোকে মেরেই ফেলব আমি।'

ছেলেটি ছুটে এল, 'প্লিজ, শান্ত হোন, প্লিজ—!'

নেতা এবার ছেড়ে দিলেন সৌমিত্রকে, 'কী এবার লিখবি?'

সৌমিত্র বসে পড়েছিল দুহাতে মাথা ঢেকে। সেই অবস্থায় সে বলল, 'না।'

নেতা আবার তেড়ে আসছিল এইসময় গলা পাওয়া গেল, 'কী ব্যাপার?'

সৌমিত্র মুখ তুলে দেখল জেস্টার এগিয়ে আসছে। নেতা তাকে বলল, 'এই ডাক্তার আমাকে অপমান করেছে। আমার নির্দেশ মানেনি।'

'কেন?'

'এই বাঙালির বাচ্চাটাকে খুন করা উচিত।' নেতা চেঁচাল।

জেস্টার এগিয়ে গেল সৌমিত্রর কাছে, 'ডক্টর।'

সৌমিত্র মাথা নাড়ল, 'আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তুমি ওষুধের নাম লিখবা না?'

'লিখে দিয়েছি।'

জেস্টার ছেলেটির দিকে তাকাতে সে বলল, 'হ্যাঁ, উনি একটা বড় লিস্ট লিখে দিয়েছেন।'

'কিন্তু তাতে অ্যান্টিবায়োটিকের নাম নেই, লাইফসেভিং কোনও ওষুধ নেই,' নেতা বলল।

ছেলেটি বলল, 'উনি বলেছেন পেশেন্ট না দেখে ওসব ওষুধ দেওয়া যায় না।'

'ঠিকই।' জেস্টার বলল, 'উলটো কাম হইতে পারে। কার শরীরে কী আছে তা জানা না থাকলে ওইসব ঔষধ খাওয়ানো ঠিক না।'

'আমি এটাই বলতে চেয়েছি।' সৌমিত্র কোনওমতে উঠে দাঁড়াল।

'তুমি এই কারণে ওকে মারলা?'

'না মানে—!'

'বুঝছি। চলো আমার সাথে।'

'আমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কথাটা কমিটিরে বলবা। এই লোকটারে ধরার পর থিকা আমরা ওর শরীরে হাত দিই নাই। ডক্টর আমাদের সাথে কোঅপারেট করছে। আজ সে কোনও অন্যায় না করা সত্ত্বেও তুমি তারে মারছ। এ ব্যাপারে দলের যা আইন তা তোমার জানা আছে।' জেস্টার নেতাকে নিয়ে চলে গেল।

ছেলেটি এগিয়ে এল, 'সরি।'

'এই লোকটার কী হবে?'

'ছয় ঘা বেত। আমাদের দলের কেউ অন্যায় করে ছাড়া পায় না।' ছেলেটি বলল।

দুটো গাড়ি যখন চা-বাগানে পৌঁছোল তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। জায়গাটা পাহাড়ি। চা-বাগানের লাগোয়া জায়গায় বাড়িঘর কম। যা আছে সেগুলো বাংলো টাইপের। অনেকটা জমি নিয়ে তার বাউন্ডারির ভিতর বাংলো। চারপাশ খুব শান্ত।

কুদ্দুসসাহেব খবর পেয়ে ছুটে এলেন, 'আসেন আসেন সোনাভাই। একেবারে সদলবলে?'

'একটু অসুবিধায় ফেললাম আপনাকে।' সোনাচাচা বললেন।

'আরে ছাড়েন! এটা আপনাদের ঢাকা শহর না, এখানে দশ-বিশজন মানুষে কোনও প্রব্লেম হয় না। কিন্তু কী ব্যাপার কন তো?' কুদ্দুসভাই জিজ্ঞাসা করলেন।

তাঁর কৌতূহল মেটাতে সোনাচাচা বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। সোফায় বসে বললেন, 'আপনাকে একটা ফোন নাম্বার দিয়েছিলাম—।'

হাত তুললেন কুদ্দুসসাহেব, 'পাইছি। এক্কেবারে নাকের সামনে।'

'তার মানে?'

'ওটা একটা সিঙ্গাপুরি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন নাম্বর।'

'সিঙ্গাপুরি?'

'হ। গেটের উপর লেখা আছে তাই। কিন্তু অনেকদিন কোনও সিঙ্গাপুরিকে ওখানে কেউ দেখে নাই। লোকজন অবশ্য থাকে কিন্তু তারা কারও সঙ্গে মেশে না। ডিস্টার্ব করে না তাই আমরাও কোনও কৌতূহল দেখাই না।'

'কতজন লোক থাকে?'

'তা তো জানি না মিঞা। তবে এক মহিলা আছেন, মনে হয় বার্মিজ বা সিঙ্গাপুরিয়ান, ড্রাইভার নিয়া মাঝে মাঝে বাজারে যান।'

'কেউ ওদের কাছে আসে না?'

'খবর রাখি না।'

'বাড়িটা কোথায়?'

'হাফ এ মাইল ফ্রম দিস গার্ডেন। ডান দিকের রাস্তায়। কিন্তু কী ব্যাপার? ওদের খোঁজ কর ক্যান?' কুদ্দুসসাহেব উৎসাহিত।

সোনাচাচা তখন তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। শুনে চোখ বড় হয়ে গেল কুদ্দুসসাহেবের, 'মুশকিল হইয়া গেল।'

'কেন?'

'আমার বাগানের একটা আলাদা রেসপেক্ট আছে। ধরেন আপনারা ওখানে গিয়া দেখলেন যাদের খুঁজতেছেন তারা নাই, তখনই প্রব্লেম।'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এর ফ্যামিলির কাছে আমি, আমরা কৃতজ্ঞ। আপনি তো জানেন, স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এরা আমাদের পাশে কীভাবে দাঁড়িয়েছিল!'

'জানি। ঠিক আছে। এক কাম করেন। আপনারা দিনেরবেলায় চুপচাপ থাকেন। আমার বাগানের এন্ড-এ আমারই একটা খালি কাঠের বাড়ি আছে। সেখানে সবাই গিয়া থাকেন। গাড়ি এখানে থাকুক। সারাদিন বিশ্রাম করেন, খাওয়াদাওয়া করেন, সন্ধ্যার পর দ্যাখেন ঠিক জায়গায় আসছেন কি না!' কুদ্দুসভাই বললেন।

তাই করা হল। চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে সেই খালি কাঠের বাড়িতে চলে এল ওরা। নীচে হলঘর, ওপরে দুটো শোওয়ার ঘর। কুদ্দুসসাহেব এলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে খাবার এল।

সোনাচাচা ছেলেদের নেতাকে ডেকে বললেন, 'দুজন করে ছেলে যেন বেড়াতে বেরিয়েছে এমনভাবে হেঁটে যাবে। গেটের ওপর সিঙ্গাপুরের দাতব্য প্রতিষ্ঠান লেখা সাইনবোর্ড আছে। বাড়িটার সামনে একদম দাঁড়াবে না। হেঁটে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে আসবে। লক্ষ রাখবে ওই বাড়ির ভেতরটা দেখা যায় কিনা। কেউ আসে যায় কিনা। ওরা ফিরে আসার আধঘণ্টা পরে অন্য একজনকে পাঠাবে। একজন। সে ফিরে এলে আবার দুজন যাবে। এইভাবে সন্ধে পর্যন্ত চললে হয়তো কিছু খবর পেতে পারি। বলে দাও, কেউ যেন এমন কিছু না করে যাতে ওদের মনে সন্দেহ তৈরি হয়।'

ঘণ্টা দেড়েক বাদে রিপোর্ট এল বাড়িতে কেউ নেই, অন্তত বাইরের রাস্তা থেকে তাই মনে হচ্ছে। সোনাচাচার সঙ্গে মোবাইল ছিল। বাসুদেব বলল, 'একবার ডায়াল করে দেখবেন নাকি?'

'কেন?'

'গলা শুনে বলতে পারব বিশ্বজিত দেববর্মা ওখানে আছে কি না।'

'বোধহয় ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয়ই ওর বাবাকে ফোন করে পায়নি। যা নেটওয়ার্ক বলছ তাতে নিশ্চয়ই জেনে গেছে ওর বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য ওর আর এই নাম্বারে থাকার কথা নয়। তবে বিদেশে আছে বলে ভাবতে পারে ওকে এখানে কেউ ছুঁতে পারবে না। কিন্তু আবার যদি ব্ল্যাঙ্ক কল যায় তা হলে ও পালিয়ে যেতে পারে।'

সোনাচাচার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু এত কাণ্ডের পর যদি ওই বাংলোতে গিয়ে দেখা যায় বিশ্বজিত দেববর্মা নেই তা হলে? তা হলে আগরতলায় ফেরার মুখ থাকবে না। এখন মনে হচ্ছে লটারির টিকিট কাটার মতো হয়ে গেল ব্যাপারটা। উলটে দশরথকে ধরে রাখা, যন্ত্রণা দেওয়ার পুরোটা দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। প্রমাণ করতে পারলে আইন শাস্তি দেবে না হলে টাইগাররা চুপ করে থাকবে না। বাসুদেবের খুব ইচ্ছে করছিল মোবাইলে ফোন করে দেখে বিশ্বজিত দেববর্মা ওই বাড়িতে থাকে কিনা।

শ্রীমঙ্গলের এই অঞ্চল বর্ডার থেকে বেশ কিছুটা দূরে। নিশ্চয়ই সৌমিত্রকে ধরে এনে ওরা ওই বাড়িতে রাখেনি। বাংলাদেশের এই প্রান্তে টাইগারদের কয়েকটা ক্যাম্প আছে। সেই ক্যাম্পে নিশ্চয়ই প্রচুর লোক আত্মগোপন করে আছে। এই বাংলোতে সেটা সম্ভব নয়। তা হলে কাছাকাছি ক্যাম্পটা কোথায়? সেখানেই ওরা সৌমিত্রকে রাখতে পারে। সর্বাধিনায়কের কাছাকাছি তো ওই ক্যাম্প থাকা উচিত। বাসুদেবের মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

এগারোটা নাগাদ পেট্রল টিম এসে জানাল একজন মধ্যবয়সিনী মহিলাকে ওই বাংলোতে ঢুকতে দেখা গেছে। গেট খুলে সে বাগান পেরিয়ে ভেতরের দরজায় বেল টিপছিল। কেউ খোলার আগে ওদের সরে যেতে হয়েছিল বাড়িটার সামনে থেকে। দাঁড়িয়ে থাকলে যদি কারও সন্দেহ হয় তাই দরজা খোলা পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করতে পারেনি।

সোনাচাচা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহিলাকে দেখে কী মনে হল? শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত?'

দুটি ছেলের একটি মাথা নাড়ল, 'না স্যার। বাঙালি। স্থানীয় মহিলা।'

'স্থানীয় মহিলারা কি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত হতে পারে না?' বিরক্ত হলেন সোনাচাচা।

'না, মানে কীরকম কীরকম মনে হচ্ছিল।'

ওদের বিশ্রাম করতে বলে পরের যে দলটা হাঁটতে গেল তাদের ডেকে সোনাচাচা বলে দিলেন 'তোমরা বাড়িটা পেরিয়ে এমন জায়গায় গিয়ে শেল্টার নেবে যাতে বাড়ির ভেতর থেকে কেউ তোমাদের দেখতে না পায়। ওই মহিলা মনে হয় ওখানে থাকে না। অতএব বেরিয়ে আসবেই। তোমরা অপেক্ষা করবে। ও বেরুলে ফলো করবে দূরত্ব রেখে। দেখে আসবে ও কোথায় থাকে। পুরো ব্যাপারটা যেন একদম শান্তিপূর্ণভাবে হয়।'

ছেলেদুটো মাথা নেড়ে চলে গেল।

বাসুদেবের খেয়াল হল, গতকাল ভোর থেকে সে এই ছেলেদের সঙ্গে আছে, কিন্তু ওরা কেউ তার সঙ্গে এগিয়ে আসেনি কথা বলতে। অভদ্রতা নয়, বিনয়ের

সঙ্গে একটা দূরত্ব রেখে চলেছে। সোনাচাচা থাকায় ওদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়নি বাসুদেবের। কিন্তু বাংলাদেশের এই যুবকদের মনে হচ্ছিল ঠিক সৈনিকদের মতো। তাদের নেতা যা বলেছেন তাই নীরবে পালন করছে ওরা।

ছেলেদুটোর একজনের নাম করিম আর একজন জাহিদ। রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ওরা সিঙ্গাপুরের সাইনবোর্ড লেখা বোর্ডটা দেখে ঝটপট বাংলোটাকে দেখে নিয়েছিল। দরজা জানলা বন্ধ। ভেতরে লোক আছে কি না বোঝা যাচ্ছিল না। ওরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল। বাঁদিকে একটা উঁচু ঢিবি, পর পর কয়েকটা গাছ। ওরা হাঁটতে হাঁটতে যেন প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে যাচ্ছে এই ভঙ্গিতে ঢিবির কাছে গাছের আড়ালে চলে এল। এখান থেকে বাংলোটা দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু বাগান আর গেট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ গেট থেকে কেউ বের হলে ওদের নজর না এড়িয়ে যাবে না।

আড়ালে দাঁড়িয়ে করিম বলল, 'একটা সিগারেট ধরাব?'

'না। গন্ধ পেয়ে যাবে।' জাহিদ বলল।

'কে গন্ধ পাবে? এখানে তো কেউ নেই।'

'তা হলে ধরা।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে পালা করে দুজনে টান দিতে লাগল। করিম বলল, 'ধর, আমরা এখানে আসার আগে সে চলে গিয়েছে!'

জাহিদ বলল, 'সেই স্কোপ নেই। আফজল ওয়াচ করছিল।'

করিম বলল, 'তুই চিন্তা কর জাহিদ, আমাদের দেশের মধ্যে ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা ঘাঁটি তৈরি করে আছে অথচ আমাদের সরকার কিছু বলছে না।'

'সরকার জানলে তো বলবে।'

'বাঃ, সরকারের জানার দায়িত্ব নেই।'

'একাত্তর সালেই রাজাকারদের যুগ শেষ হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে যারা মার্ডার করেছিল তারা কারা? বাংলাদেশকে ভালবাসে? না। এখনও এদেশে প্রচুর রাজাকার আছে। আমার আব্বু স্বাধীনতাযুদ্ধে মারা গিয়েছেন। তাঁর বন্ধু, আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে, এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। আলিসান বাড়ি বানিয়েছে। দশ মাস আমেরিকায় থাকে। বঙ্গবন্ধুকে গালি দেয়। পাবলিকলি কিছু বলে না অবশ্য। সে শালাও রাজাকার। এরা সর্বত্র থাকে। পুলিশ আছে, বি ডি আর-এ আছে। নিশ্চয়ই তাদের কিছু লোক রেগুলার টাকা খায় এদের কাছ থেকে। সরকারকে জানায় না।' জাহিদ বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওরা দেখতে পেল একজন মহিলা বাগান দিয়ে হেঁটে গেটের দিকে এগোচ্ছে।

ওরা ঝটপট বেরিয়ে এল রাস্তায়। যেন বেড়াতে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। মহিলা তখন গেট বন্ধ করে হাঁটা শুরু করেছে। ওরা ওর হাত পনেরো দূরে চলে এসেছিল। পেছনে দুজন যুবক আসছে বোঝামাত্র মহিলার হাঁটার ধরনই বদলে গেল। তার নিতম্ব পায়ের তালে ওঠানামা করতে লাগল। করিম ও জাহিদ কাছে এসে পড়তেই মহিলা তাকাল। করিম জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে চায়ের

দোকান আছে?'

'আপনারা কি এখানে নতুন?' মহিলা হাসল।

'হ্যাঁ। বেড়াতে এসেছি।' জাহিদ বলল।

'চায়ের দোকান বাজারের কাছে। দুই মাইল।' মহিলা হাঁটতে হাঁটতে বলল।

'অনেক দূর!' করিম বলল।

'আপনারা কেমন লোক? মেয়েমানুষের পেছন পেছন আসতেছেন?'

'পেছনটা যদি ভাল হয় তা হলে আসতে দোষ কী?' করিম হাসল।

'আপনার কথা যদি লোকে শোনে—।' মহিলা হাসল।

'আচ্ছা, যে বাড়িতে গিয়েছিলেন সেখানে রোজ যান?' জাহিদ জিজ্ঞাসা করল।

'এ আবার কী কথা? ওখানে আমি কাম করি।'

'কী কাম?'

'পরিষ্কার করি, বাসন বাজি, দু-চারটা কাপড় কাচি।'

'ওখানে কে কে আছে।'

'বলা নিষেধ।'

'নিষেধ কেন?'

'ও বাংলোর কোনও কথা বাইরে বলা নিষেধ।'

'কেন?'

'তা জানি না। চাকরি দিবার সময় সেই কথা হইছিল।'

হঠাৎ করিম গামছা সরাল। বেশ কড়া গলায় বলল, 'এই মাগি, দেখছিস?'

অস্ত্র দেখে মহিলার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'এরপরে বলবি বলা নিষেধ?'

'আপনারা—আপনারা—।' মহিলা কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

জাহিদ দেখল কিছুটা দূরে দুটো লোক কথা বলছে। সে মহিলাকে বলল, 'বাঁচতে চাও যদি ডানদিকে হাঁটো!'

'এদিকে কেউ থাকে না। চা-বাগান।' মহিলা ককিয়ে উঠল।

ওরা পাত্তা দিল না। মহিলাকে নিয়ে সোজা হাজির করল বাংলোয় যেখানে তাদের দল ছিল। খবর পেয়ে সোনাচাচার সঙ্গে বাসুদেবও নীচে নামল।

সে দেখতে পেল মাঝারি বয়সের ভাল স্বাস্থ্যের একজন মহিলা কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছে। তাকে ঘিরে রয়েছে ছেলেরা। ওরা যেতেই একজন মহিলাকে বলল, 'সাহেব যা যা জিজ্ঞাসা করবেন তার জবাব দাও।'

সোনাচাচা জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম কী?'

'জিনাত।'

'বাসায় আর কে আছে?'

'আমার বাসায়? শ্বশুর থাকে সাথে।'

'কেন? স্বামী কোথায় গেল?'

'সে নাই।'

'কী কর তুমি?'

‘আগে দুই বাসায় কাম করতাম এখন ওই এক বাংলোতে করি।’

‘কেন? আর একটা কাজ ছেড়ে দিয়েছ কেন?’

‘আগে দুই বাসায় কাম কইর‍্যা পাইতাম হাজার। এখন ওই এক বাংলো থিকা পাই দেড় হাজার। তারা বলছে আর কুথাও কাম যেন না করি।’

‘কেন?’

‘জানি না।’

‘ওই বাংলোর কাজ কীভাবে পেয়েছ?’

‘একজন খবর দিছিল।’

‘কতদিন আছ ওখানে?’

‘ওখানে আমি থাকি না।’ মহিলা প্রতিবাদ করল।

‘আরে না! কতদিন কাজ করছ ওখানে?’ সোনাচাচা সংশোধন করলেন।

‘ঈদের পর থিকা।’

‘তা হলে তো অনেক মাস হয়ে গেল। এখন মন দিয়ে শোনো। ওই বাড়ি সম্পর্কে আমাদের কিছু কথা তুমি বলবে। ওখানে এখন ঠিক কতজন লোক থাকে?’ সোনাচাচা তাকালেন।

মহিলা মাথা নিচু করল। তারপর মাথা নেড়ে নীরবে না বলল।

সোনাচাচা বলল, ‘তোমাকে কথা বলতে হবে।’

‘নিষেধ আছে। ওই বাংলোর কোনও কথা বাইরে যদি বলি তাইলে তারা আর কামে রাখবে না।’ মহিলা কাতর গলায় বলল, ‘প্রথম দিনই তারা কথাটা বলছে।’

‘ওরা জানতেই পারবে না। আমরা বাইরে থেকে এসেছি। আজ রাতেই চলে যাব। তুমি আমাদের কী বলছ তা ওরা জানবে কী করে? নির্ভয়ে বলো।’

‘না সাহেব, পাপ হবে।’

‘ওরা আমাদের দেশের শত্রু। ওদের সাহায্য করাই তো পাপ।’

‘কী যে কন! দেশের শত্রু! বি ডি আরের বড় বড় সাহেবরা ওখানে যায়!’

‘কী নাম তাদের?’

‘নাম তো জিগাই নাই।’

‘দেখো জিনাত, তুমি যদি মুখ না খোল তা হলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই যে ছেলেদের দেখছ এরা তোমাকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে পারে।’

হঠাৎ কাঁদতে লাগল জিনাত। কাঁদতে কাঁদতে জানাল ওই চাকরিটা চলে গেলে সে না খেয়ে মরবে। সকাল বিকেলে দু'ঘণ্টার কাজের জন্যে কেউ দেড় হাজার টাকা দেবে না। করিম চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না, ‘তোমার বয়স তো বেশি নয়, আবার বিয়াসাদি করতেছ না কেন?’

জিনাত মাথা নাড়ে, ‘সবাই চায় মজা মারতে, বিয়ে করবে কে? আপনি করবেন?’

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠল। করিম সরে গেল সেখান থেকে।

সোনাচাচা বললেন, 'তোমার যাতে বিপদ না হয় সেটা আমরা দেখব। তুমি জানো না ওরা কাল সকালের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবে। তুমি গিয়ে কাউকে দেখতে পাবে না।'

'কী কন আপনি?'

'ঠিক বলছি।'

'তাই ওরা কাল আমারে ছুটি দিছে?'

'তুমি চেয়েছিলে ছুটি?'

'না। মেমসাহেব বলল কাল তোর ছুটি।'

'তা হলে বুঝতেই পারছ। মেমসাহেব বাংলা বলে?'

'হ্যাঁ। সে তো বাঙালিই।'

'এই যে শুনলাম আরাকানের মেয়ে।'

'কী জানি! পাহাড়ের বাঙালিরা যেমন হয়।'

'মেমসাহেব ছাড়া আর কতজন লোক থাকে?'

'এক দুই—চারজন।'

'তারা কারা?'

চোখ বন্ধ করল জিনাত, 'বড় সাহেব, দুজন লোক, ওরা চৌকিদার, রান্না যে করে সে-ই গাড়ি চালায়। আর মেমসাহেব তো আছেই।'

বাসুদেব চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ। এবার উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বড়সাহেব আজ এখন ওখানে আছে?'

অবাক হয়ে তাকে দেখে জিনাত মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'তোমার বড়সাহেবের নাম কী?' সোনাচাচা জিজ্ঞাসা করলেন।

'জানি না। সাহেবদের নামে আমাদের তো কোনও কাম নাই।'

'বাংলোয় তিনি কী করেন?'

'বই পড়েন। পেপার পড়েন। আর যখন দেখি না তখন বুঝি নিজের ঘরে আছেন। সেখানে গিয়ে বোধহয় কথা বলেন।'

'কার সঙ্গে?'

'জানি না।'

'তার মানে ওই ঘরে আর একজন থাকে?'

'তাকে দেখি নাই।'

'তা হলে মেমসাহেবকে নিয়ে পাঁচজন নয়, ছয়জন ওই বাংলোতে থাকে।'

'হইতে পারে।'

'তা তোমার মেমসাহেব মানুষটা কেমন?'

'ভাল। গলার আওয়াজ বড় মিঠা।' হাসল জিনাত।

'ওই বাংলোতে ঢোকার দরজা কটা?'

'দুটা। একটা সামনে থিকা আর একটা পিছনে।'

'ঠিক আছে জিনাত। এইসব খবরের জন্যে তোমাকে পাঁচশো টাকা দিচ্ছি।' পকেট থেকে সোনাচাচা টাকা বের করে গুনে নোটগুলো ওর হাতে দিলেন।

‘এইবার তোমার ঠিকানাটা বলো।’

‘ক্যান?’

‘তোমার বুড়ো শ্বশুর একা বাড়িতে আছে। সেটা ঠিক না। ওঁকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি। কাল সকাল পর্যন্ত তোমরা এখানেই থাকবে।’

‘না। আমি বাসায় যাব।’ জিনাত সোজা হল।

‘কথার অবাধ্য হয়ো না। এখানে থাকলে কেউ তোমাকে অসম্মান করবে না। কিন্তু কাল সকালের আগে আমরা তোমাকে ছাড়তে পারি না।’ সোনাচাচা উঠে এলেন।

দুপুরের পর সোনাচাচা আর একবার জিনাতের সঙ্গে কথা বলে বাংলোটার ম্যাপ আঁকলেন। ইতিমধ্যে জিনাতের শ্বশুরকে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ছেলের বউকে দেখে বুড়ো বেশ অবাক। কেন তাকে ডাকা হল তা জানার পর একটিও কথা বলেনি। দুপুরের খাবার খেয়ে ওপরের ঘরে শুয়ে পড়েছে। জিনাতও সেখানে আছে। ছেলেরা একটা রসিকতা করার সুযোগ পেয়ে গেছে করিমের সঙ্গে। সে বেচারা কিছুতেই দোতলায় উঠছে না।

কুদ্দুসসাহেব সারাদিনে এই তল্লাটে আসেননি। চা-বাগান আর গাছগাছালিতে জায়গাটা এত নির্জন যে এতজন লোকের অবস্থান কেউ জানতে পারছে কিনা সন্দেহ। কুদ্দুসসাহেব এলেন সন্ধের পরে। পায়ে হেঁটে। সোনাচাচাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু বলে তিনি বাসুদেবের কাছে এলেন, ‘আরে মশাই, কইবেন তো! আপনার রিপোর্ট আমরা রেডিয়োতে শুনি। টিভিতেও আপনার নাম বলে।’

‘এখানে বিদেশের টিভি দেখতে পান?’ বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

‘আমার নিজস্ব ডিসঅ্যান্টেনা আছে। আমার সৌভাগ্য যে আপনি আসছেন। তবে একটা রিকোয়েস্ট ; এখানে কোনও অ্যাকশনে আপনার যাওয়া ঠিক না।’ কুদ্দুসসাহেব গলা নামালেন, ‘প্রথম কথা, আপনি বিদেশি। দ্বিতীয় কথা, আপনার সাথে বৈধ কাগজ নাই।’

বাসুদেব অস্বস্তিতে পড়ল, ‘তা হলে?’

‘আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। যদি কেউ খুন হয় অথবা যদি কাউরে হসপিটালাইজ করতে হয় তা হলে পুলিশ এনক্যুয়ারি করবই। আর তখন তারা আপনার কথা জানলে কেসটা অন্যরকম হইতে পারে।’

কুদ্দুসসাহেবকে সমর্থন করলেন সোনাচাচা, ‘উনি ঠিকই বলছেন বাসুদেব। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে এখানে কোনও অবৈধ কাজকর্ম হলে আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। সেটা অন্যায় নয়। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না।’

‘কিন্তু আমি না থাকলে বিশ্বজিতকে তো ট্যাক্‌ল করতে পারবেন না।’ বাসুদেব বলল।

‘পারব। তোমার ওই টিকটিকির সাহায্য ছাড়াই পারব।’ সোনাচাচা বললেন।

কুদ্দুসসাহেব ফিরে গেলেন তাঁর বাংলোয়। নিজের মোবাইল নাম্বার দিয়ে গেলেন। সোনাচাচা দলের কয়েকজনকে নিয়ে মিটিং করলেন। ঠিক রাত নটার

সময় ওই বাংলোর দুদিক কভার করা হবে। কীভাবে আক্রমণ করা হবে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখো তো, ওই ঘরে একটা ফোন আছে, তার নাম্বার কত?'

বাসুদেব দেখল। ফোনটা চালু আছে। সে নাম্বারটা বলল। সোনাচাচা দ্রুত নিজের মোবাইলে নাম্বার তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সঙ্গে দশরথ দেববর্মার মোবাইল আছে, তাই না।'

'হ্যাঁ। তবে সেদিন থেকেই অফ করে রেখেছি।'

'ঠিক করেছ। এবার আমার এই নাম্বারে তুমি কল করো তো।' নাম্বারটা বললেন তিনি। মোবাইলটা অন করে নাম্বারগুলো টিপতেই সোনাচাচার মোবাইলে রিং শুরু হল। ওটাকে অফ করে তিনি বললেন, 'তা হলে আমাদের দুজনের মোবাইলেই নাম্বারটা উঠে গেল। তোমার কাজ হবে অ্যাকশন শুরু হওয়ার সময় থেকে এই ঘরে অপেক্ষা করা। আমি কোনও সমস্যায় পড়লেই তোমাকে ফোন করব। হয় মোবাইলে নয় ওই ফোনে। আমরা সবসময় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখব। আমাদের দুজন ছেলে নীচে পাহারায় থাকবে। যদি কোনও গোলমাল হয়, যদি পরিকল্পনা ভেস্তে যায় অথবা আমরা ফিরে না আসতে পারি তা হলে ওরা তোমাকে নিয়ে আজ রাতেই এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। সেরকম খবর পেলে একমুহূর্তও এখানে থেকো না। অর্থাৎ তুমি অ্যাকশনে যাচ্ছ না বটে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা হেডকোয়ার্টার্সে বসে মনিটারিং করছ।'

মাথা নাড়ল বাসুদেব। হঠাৎ তার খেয়াল হল বিশ্বজিত দেববর্মা যদি সত্যি ওখানে থাকে তা হলে সে গেলে আর একটা সমস্যা হত। লোকটা হয়তো তাকে চিনতে পারত। পারলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যেতে পারত। সে যেতে পারছে না জানার পর একটু মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই ব্যাপারটা ভাবার পর সেটা কমে গেল। সোনাচাচার ওপর তার গভীর আস্থা জন্মেছে।

রাত আটটার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল। এমনিতেই নির্জন জায়গা, রাত আটটাতেই মনে হচ্ছে গভীর রাত। দূরে চা-বাগানের ফ্যাক্টরি বাংলোর টিমটিমে আলো ছাড়া কোথাও কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। সাড়ে আটটা নাগাদ ওরা বেরিয়ে গেল। গেট অবধি গিয়ে ওদের বিদায় দিয়ে বাসুদেব চলে এল দোতলায়। দুটো ছেলে রয়ে গেল নীচে। তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গে গামছা জড়ানো। অর্থাৎ ওরা সশস্ত্র।

ঘরের দিকে যেতেই সে দেখল জিনাত দাঁড়িয়ে আছে রেলিং-এর পাশে। এখানে এখন হ্যারিকেন জ্বালানো আছে। জিনাত বলল, 'আপনি যান নাই?'

'কোথায়?' বাসুদেব বিরক্ত হল।

'ওই, যেখানে ওরা যায়।'

'তোমার কী দরকার? যাও, ওই ঘরে যাও।'

'অদ্ভুত। সারা সময় শ্বশুরের মুখের সামনে বইস্যা থাকা যায়?'

'তা হলে চুপ করে থাকো। নীচে নামার চেষ্টা করো না।'

'একটা কথা কই?'

'কী কথা?'

'আপনারা কারা?'

'তোমার মতোই মানুষ। যাও, ভেতরে যাও।' দ্বিতীয় ঘরটিতে ঢুকে পড়ল বাসুদেব। এখন ফোনের সামনে বসে থাকা।

পায়ে হেঁটে ওরা বাড়িটার চারপাশে চলে এল। এরকম নির্জন আধাপাহাড়ি জায়গায় বাংলোগুলো যেমন হয় এটিও তেমনি। সামনে বাগান, একতলা-দোতলা মিলে অনেকগুলো ঘর। সব কটা ঘরের জানলা দরজা এখন বন্ধ। কিন্তু কাচের জানলা দিয়ে ভেতরের আলো বাইরে আসছে। অন্ধকারে সোনাভাইয়ের নির্দেশে ছেলেরা পজিশন নিল। পেছনের দরজার খুব কাছে চলে গেল তিনজন। কেউ ওই দরজা খুলে বেরুতে চাইলেই ওরা গুলি চালাবে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গুলি যেন পা লক্ষ্য করে চালানো হয়।

সোনাভাই এবং আরও তিনজন গেট খুলে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খোলা গেট দিয়ে ঢুকে গেল বাকিরা। বাংলোটার প্রায় গায়ে সেঁটে রইল তারা। সোনাভাই বোতাম টিপে বেল বাজালেন। দ্বিতীয়বারে ভেতর থেকে গলা পাওয়া গেল। পরিচয় জানতে চাইছে।

'কর্নেল হবিবুল্লা পাঠিয়েছেন। জরুরি।' সোনাভাই গলা তুললেন।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর আবার জিজ্ঞাসা, 'কোন কর্নেল? বি ডি আরের?'

'হ্যাঁ।' দাঁতে দাঁত চাপলেন সোনাভাই।

দরজাটা খুলে গেল। স্বাস্থ্যবান একটি লোককে দেখামাত্র করিম ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে কিছু বোঝার আগেই তাকে মাটিতে ফেলে বেঁধে ফেলল ওরা। মুখ বাঁধল যাতে শব্দ করতে না পারে।

'কে এসেছে জামাতিয়া?' গলাটা এগিয়ে আসছিল।

এই ঘরে ঢুকতেই লোকটা হতভম্ব হয়ে গেল। চারটে রিভলভার তার দিকে তাক করা আছে। সে ধীরে ধীরে হাত ওপরে তুলল। জাহিদ এগিয়ে গিয়ে ওর ঘাড়ে একটা রদ্দা মারতেই লোকটা কাটা কলাগাছের মতো নীচে পড়ে গেল। লোকটাকে বাঁধা হল চটপট। তারপর দ্বিতীয় ঘরের দিকে পা বাড়াল ওরা। একজন মহিলা গান গাইছে। টিভি বা রেডিয়োতে নয়। গান বাংলা ভাষায় নয়। মহিলাকে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ গান থেমে গেল এবং তাঁর গলায় চিৎকার শোনা গেল, 'জামাতিয়া!'

সোনাভাই যতটা সম্ভব গলায় সম্ভ্রম এনে বললেন, 'জি!'

'জি? তুমি বাংলাদেশের মানুষ নাকি? জি।' খুব হাসলেন মহিলা, 'শোনো, অ্যাই শুনতেছ, জামাতিয়াও জি বলতেছে।'

'এখানে শুনছে। ভাল। ডাকো ওরে!'

'জামাতিয়া।' মহিলা ডাকলেন।

'বলেন?'

'বেল বাজাইল কে?'

'ক্যাপ্টেন হবিবুল্লা আসছেন। সাহেবরে বলেন।' গলাটা নিচুতে রাখলেন সোনাভাই, কথাগুলো বলেই পজিশন নিয়ে নিলেন ওঁরা। দরজার দুপাশে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন যাতে কেউ ঢুকলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু যিনি ঢুকলেন তাঁর কথা ভাবেননি সোনাভাই। জিন্‌স আর শার্ট পরা এক মহিলা ভেতরে ঢুকতেই করিম ও জাহিদ তাঁর মুখ চেপে ধরল।

মহিলা নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ওরা সুযোগ দিল না। মহিলার মুখ এবং হাত পা বেঁধে ফেলা হল। মেঝেতে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁকে। সোনাভাই দেখল মহিলার চোখ বিস্ফারিত। তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না।

সোনাভাই রিভলভারটা মহিলার মাথায় চেপে ধরতেই তিনি সজোরে মাথা নাড়তে লাগলেন। মৃত্যুভয় তাঁর মুখ চোখে ফুটে উঠল। সোনাভাই বললেন, 'আপনাকে মারব না যদি আপনি আপনার সাহেবকে এখানে ডাকেন। খুব নর্মাল গলায় ডাকবেন। কি রাজি?'

মহিলা মাথা নাড়লেন যার মানে বোঝা গেল না। সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও, তা হলে আপনি মরতে চাইছেন?'

মহিলা মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন।

'তা হলে?'

সমস্যায় পড়লেন সোনাভাই। ওঁর বক্তব্য শুনতে হলে মুখ খুলে দিতে হয়। সেটা খুব ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু মহিলার ডাক শুনলে ওঁর স্বামী নিশ্চয়ই কোনও সন্দেহ না করে এই ঘরে আসতেন। না ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। সঙ্গীদের ইশারা করে হুড়মুড় করে সোনাচাচা ভেতরে ঢুকে পড়লেন। বড় খাওয়ার ঘর। বাঁদিকে সিঁড়ি ওপরে চলে গিয়েছে। ওপর থেকে গলা ভেসে এল, 'ডার্লিং!'

সোনাভাই দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরের ঘরে যেতেই মুখোমুখি হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার উঁচিয়ে ধরতেই লোকটি দুটো হাত মাথার ওপরে তুলল। করিম তার কাজ চটপট শেষ করতেই গুলির আওয়াজ ভেসে এল। সোনাভাই দেখলেন জাহিদ মাটিতে শুয়ে পড়ে রিভলভারের ট্রিগার টিপল। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের দরজার সামনে দাঁড়ানো একটা লোক যে এই মুহূর্তে গুলি ছুড়েছিল ধপ করে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'জাহিদ?'

'আমি ঠিক আছি সোনাভাই। এক ইঞ্চি দূর দিয়ে গুলি গেল।' জাহিদ হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে করিম লোকটাকে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু হিসাব মিলছিল না। সোনাভাইয়ের মতে আর একজন লোকের এখানে থাকার কথা। জিনাত বলেছে বিশ্বজিত দেববর্মা ওপরের ঘরে বসে কারও সঙ্গে কথা বলে।

পুরো বাংলোটা খুঁজে দেখা হল। গুলির শব্দ শুনে বাইরে থেকে ছেলেরা একে একে ভেতরে চলে এল। না, আর কেউ এখানে নেই।

নীচের বড় ঘরটাতে নিযে আসা হল গৃহকর্তাকে। চেয়ারে বসিয়ে সোনাভাই আর একটা চেয়ার টেনে সামনে বসলেন। ওঁর নির্দেশে লোকটির মুখের বাঁধন

খুলে দেওয়া হল।
সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম?'
লোকটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'তার আগে আপনাদের আইডেন্টিটি জানতে চাই।' লোকটি কথা বলল পরিষ্কার ইংরেজিতে।
'আমরা পুলিশ। কেন্দ্রীয় পুলিশ।'
'পুলিশ—!' লোকটি যেন খুব অবাক হল।
'হ্যাঁ। ঢাকা থেকে এসেছি। আমাদের কাছে খবর আছে এই বাড়িতে কিছু বেআইনি কারবার হচ্ছে।'
'ভুল। ভুল খবর। আমরা এখানে কোনও বেআইনি কাজ করছি না।'
'আপনি বাংলাদেশের নাগরিক?' সরাসরি প্রশ্ন করলেন সোনাভাই।
'না, মানে, আমরা নাগরিকত্বের জন্যে আবেদন করব ঠিক করেছি।'
'তার মানে আপনারা ভারতীয় নাগরিক, বেআইনিভাবে এখানে আছেন।'
'আমরা বাধ্য হয়েছি এখানে চলে আসতে। অবশ্য এর জন্যে আপনাদের বি ডি আর-এর কাছে আবেদন করেছিলাম এবং ওরা আমাদের এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।'
'বি ডি আর তো অনুমতি দেওয়ার মালিক নয়। ওরা কি লিখিত অনুমতি দিয়েছে?'
'না। দুজন অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।'
'তাদের নাম জানতে পারি?'
'দুঃখিত, আমার পক্ষে নাম বলা সম্ভব নয়।'
'কেন?'
'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন স্যার।'
'বাঃ। চমৎকার। বি ডি আর-এর দুজন অফিসারকে আপনি তুষ্ট করবেন আর আমরা বঞ্চিত হব? এটা কি মেনে নেওয়া যায়, বলুন?'
আশ্চর্য, আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি কেন? আমি যখন ওই দুজনকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছি আপনার সঙ্গেও বন্ধুত্ব করতাম। তা হলে এইভাবে আপনাদের আসতে হত না। আপনারা আমার প্রিয় কুক কাম ড্রাইভারকে মেরে ফেলেছেন। ও বেচারা মারা যেত না।' উত্তেজিত হল লোকটা।
'গুলি আপনার লোক প্রথমে চালিয়েছিল। গলা তুলে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। কিন্তু এখনও আপনি আপনার নাম জানালেন না।'
'আমার নাম ক্ষেত্রজয়।'
সোনাভাই উঠলেন। খুব সাধারণভাবে হেঁটে লোকটির কাছে গিয়ে সজোরে চড় মারলেন, 'আমি মিথ্যে কথা একদম সহ্য করতে পারি না। আমি ভদ্রভাবে কথা বলছিলাম, আপনি আমাকে উত্তেজিত করছেন।'
লোকটি সামান্য হতভম্ব হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দ্রুত সামলে নিল, 'আপনারা কী চান?'
'কী চাই বলে আপনার মনে হচ্ছে?'

'টাকা। কত টাকা চান?'

'বি ডি আর-এর ওই দুই অফিসারকে কত দেন?'

'এক লাখ করে, দুজনকে।'

'শুধু এখানে আপনারা কয়েকজন থাকবেন তার জন্যে মাসে দুই লাখ কেউ খরচ করে না। আপনার বাকি লোকজন কোথায় আছে?'

'এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে।'

'তারা কারা?'

'ভারত সরকার যাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন করেছে, সেখানে থাকলে সরকার যাদের গুলি করে মারত কোনও আইনের পরোয়া না করে তারাই আমার সঙ্গে সীমান্তের এপারে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ওখানে ওরা ক্যাম্প করে আছে। খুব শিগগির আমরা আপনাদের সরকারের কাছে আবেদন জানাব পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের জন্যে।'

'কতজন আছে ওখানে?'

'চল্লিশজন।'

'ব্যস, ওই একটাই ক্যাম্প?'

'আর একটা ট্রানজিট ক্যাম্প আছে বর্ডারের কাছাকাছি যাতে কেউ পালিয়ে এসে বিপদে না পড়ে, তাদের সাহায্য করার জন্যে, সেখানে চার-পাঁচজনের বেশি থাকে না।'

'আপনাদের ওপর ভারত সরকার কেন অসন্তুষ্ট?'

'আমরা আমাদের মাটির দখল চেয়েছিলাম। আমাদের মাটি অন্য লোক ভোগ করুক তা চাইনি। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। তাই—!'

'এবার আপনার নাম বলুন।'

'আমার নামে আপনার কী দরকার? আপনার টাকা পেলেই তো হল!'

'কত টাকা দেবেন?'

'ওরা এক করে নিলে, আপনিও তাই নেবেন।'

'মাত্র এক লাখ টাকার জন্যে ঢাকা থেকে কেউ এত দূরে আসে? আপনি কি পাগল? তা ছাড়া আমি মাস্থলি সিস্টেমে বিশ্বাস করি না। আপনারা তো সমানে কিডন্যাপ করে যাচ্ছেন আর লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করেন। আমার এক কোটি চাই।' সোনাভাই বললেন।

'অসম্ভব। এই মুহূর্তে আমার কাছে অত টাকা নেই।'

'কত আছে?'

'দুই লাখ।'

'এর মধ্যে তো আপনার হাতে পঁচিশ লাখ টাকা এসে যাওয়ার কথা!'

লোকটি অবাক হয়ে তাকাল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

'আগরতলার খবর তো ঢাকাতেও আসে।'

'ও। না, আসেনি। এখনও আসেনি।'

'আপনার নাম বললেন না এখনও।'

'আপনি এত জানেন আর আমার নাম জানেন না।'

'আপনার মুখে শুনে কনফার্মড হতে চাই।'

'বিশ্বজিত দেববর্মা।

'দেববর্মা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি মনে করেন না যে ভারতে কোনও ক্রাইম করে এসেছেন?'

'না।'

'শুনুন মশাই, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এখানে এসেছি। ডাক্তার সৌমিত্র এখন কোথায়?'

'কে ডাক্তার সৌমিত্র?'

'আপনি যেন কখনও নাম শোনেননি?'

'না। এরকম নাম কখনও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না।'

'একে আপনারা কিডন্যাপ করেছেন। এর মুক্তিপণ হিসেবে পঁচিশ লক্ষ টাকা চেয়েছেন।'

'একদম বাজে কথা। হয়তো অন্য কোনও দল করেছে, আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।'

সোনাভাই তাকালেন। তারপর চলে এলেন বাইরের ঘরে। মোবাইলের একটি বোতাম দুবার টিপতেই ওপাশে রিং হল। বাসুদেবের গলায় উত্তেজনা বোঝা যাচ্ছে, 'হ্যাঁ। হ্যালো!'

'অপারেশন সাকসেসফুল। ওদের একজন মারা গিয়েছে।'

'আমাদের?'

'সব ঠিক আছে। কিন্তু বিশ্বজিত বলছে সৌমিত্র ডাক্তারের নামই শোনেনি। কী করব?'

'মিথ্যে কথা বলছে। মিথ্যে কথা।'

'কিন্তু কীভাবে প্রমাণ করব ও মিথ্যে বলছে?'

'আপনি ওর বাবার মোবাইল নাম্বারটা বলে বলুন, দশরথ দেববর্মা স্বীকার করেছে।'

'তাতেও যদি রাজি না হয়?'

'তা হলে ওই নাম্বারে ফোন করে আমাকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি ওর বাবার হয়ে জবাব দেব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

মোবাইল অফ করে আবার বিশ্বজিতের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন সোনাচাচা। 'দশরথ দেববর্মার নাম আপনি শুনেছেন?'

কপালে ভাঁজ পড়ল বিশ্বজিতের। মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'গুড। দশরথ বলেছেন আপনার দল সৌমিত্র ডাক্তারকে কিডন্যাপ করেছে।'

'মিথ্যে কথা। তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই। সে সি পি এম করে, আমার অ্যান্টি পার্টি। এরকম কথা তার মুখ থেকে বেরুতেই পারে না।' খুব জোর

দিয়ে বলল বিশ্বজিত।

'কিন্তু বলেছেন। আপনি তার সঙ্গে কথা বলবেন?'

'কী করে বলব? কোথায় আছে তাই আমি জানি না!'

'আমি আপনাকে সাহায্য করছি।' সোনাচাচা মোবাইল নাম্বারটা নিজের সেট অন করে দেখে বললেন। শুনে মুখ নিচু করল বিশ্বজিত। তারপর বলল, 'বাংলাদেশের পুলিশ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।'

'তা হলে স্বীকার করছেন?'

'উপায় কী?'

'ডাক্তার এখন কোথায়?'

'ওকে আপনাদের কী দরকার?'

'বললাম তো, প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে আমরা এখানে এসেছি।' সোনাভাই বললেন, 'ওকে কি ওই ক্যাম্পে রেখেছেন আপনারা?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে ছেড়ে দিন।'

'তার মানে?'

'সৌমিত্র ডাক্তারকে ছেড়ে দিতে হবে।'

'অসম্ভব। আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'আমি একাই সব নয়। আমাদের দলের অন্য নেতারা এরজন্যে কৈফিয়ত চাইবে।'

'আপনি দলের সেক্রেটারি। আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করুন।'

ঠিক সেইসময় বাইরের রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ হল। গাড়িটা থামল। সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে দৌড়ে এল ভেতরে, 'স্যার! দুজন লোক গাড়ি থেকে নামছে।'

সোনাভাই-এর ইঙ্গিতে বিশ্বজিতের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। বাইরের ঘরে এবং মাঝখানের ঘরে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে তুলে নিয়ে আসা হল ভেতরে। বেল বাজল।

সোনাভাই সাড়া দিলেন, 'কে?'

'আমরা। কুইক।'

'কে আপনারা?'

'আশ্চর্য! নতুন লোক নাকি!' একজন বিরক্ত হল।

দ্বিতীয়জন জবাব দিল, 'ফ্রেন্ড!'

ছেলেরা সব তৈরি ছিল। সোনাভাই দরজা খুলতে লোকদুটো যেন নিজের বাড়িতে ঢুকছে এমন ভঙ্গিতে ভেতরে পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেরা। কিন্তু ওদের কবজা করতে সময় লাগল। মাথায় আঘাত করতে হল। দুজনেই সশস্ত্র। সিভিল ড্রেসে থাকলেও সামরিক ট্রেনিং আছে বলে বোঝা যাচ্ছিল।

লোকদুটো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তাদের বন্দি করে সোনাভাই বললেন,

'গাড়িতে কে কে আছে দেখে ব্যবস্থা নাও। শোনো, পালাতে যাতে না পারে।'

তিনি মোবাইল অন করলেন, 'স্বীকার করেছে। এরমধ্যে দুজন গেস্ট এসেছে এ বাড়িতে। আমি ওকে বাধ্য করছি ডাক্তারকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু ও যদি ক্যাম্পে যেতে চায় তা হলে কী বলব?'

'ফোনে অর্ডার দিতে বলুন। আমার মনে হয় ওর কাছে অয়্যারলেস সেট আছে। এর আগে একজনের মুক্তিপণ হিসেবে টাকার সঙ্গে অয়্যারলেস সেট নিয়েছিল ও।' বাসুদেব বলল।

'ঠিক হ্যায়।'

ফিরে এলেন সোনাভাই। বিশ্বজিতের মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। সোনাভাই তাকে বললেন, 'আপনার দুজন গেস্ট এখন আমাদের দখলে।'

'সর্বনাশ। ওরা অফিসার। করেছেন কী?'

'আমরা ঠিকই করেছি। বিশ্বাসঘাতকদের কোনও জায়গা নেই বাংলাদেশের নিরাপত্তাবাহিনীতে। যাক গে, আপনি ফোনে ওদের অর্ডার দিন ডাক্তারকে ছেড়ে দিতে।' সোনাভাই বললেন।

'আমি তো বললাম, আমার একার কোনও ক্ষমতা নেই।' মাথা নাড়ল বিশ্বজিত।

'আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। এই কথা শোনার পর আমি আপনাকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দেব তা জানেন।'

'সত্যি কথা বলুন তো, কে আপনাদের পাঠিয়েছে?'

'আমার কথা জেনে আপনার কোনও লাভ নেই। ফোন করুন।'

'ওখানে ফোন নেই।'

'ফোন নেই মানে? এ সময় কেউ মোবাইল রাখে না বলে বিশ্বাস করতে বলছেন?'

'হ্যাঁ। যাঁর কাছে ছিল তিনি এখন অন্য জায়গায় আছেন।'

'তা হলে?'

'আপনার কথা শুনে যদি ডাক্তারকে মুক্তি দিতে হয় তা হলে আমার ওখানে যাওয়া দরকার।'

'আপনার যেতে হবে না। জায়গাটা কোথায় বলুন?'

'আপনারা যাবেন?' অদ্ভুত হাসল বিশ্বজিত।

'যাব।'

'বেশ। কবে যাবেন?' খুব নিশ্চিত দেখাল লোকটাকে।

'আপনি তা হলে চিঠি লিখে দিন।'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই লিখব।' হাসল বিশ্বজিত।

ওর হাত খুলে দেওয়া হল। কাগজ কলমের ব্যবস্থা হল। সোনাভাই ভেতরের ঘরে এলেন। মোবাইল চালু করলেন, 'ও বলছে ওখানে কোনও ফোন নেই। চিঠি লিখে দিচ্ছে, সেই চিঠি নিয়ে আমরা যাচ্ছি।'

'কেন?' বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

'ডাক্তারকে নিয়ে আসতে। ক্যাম্পে আছে বলে স্বীকার করেছে।'

'না না। কখনও না। ওর দলবলের কাছে আধুনিক অস্ত্র আছে। ওদের সংখ্যাও অনেক। আপনাদের বিপদে ঠেলে দিচ্ছে লোকটা। ফোন না থাক, অয়্যারলেস আছে ওর কাছে। খোঁজ করুন।' বলতে বলতে খুব আপশোশ হচ্ছিল বাসুদেবের। সে যদি ওখানে থাকতে পারত!

'ঠিক আছে।' মোবাইল অফ করে ভেতরে এলেন সোনাভাই। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে ক্যাম্পের লোকজন কীভাবে যোগাযোগ করে?'

'খুব অসুবিধে হয়। দরকার হলে কেউ আসে।'

'আপনি যদি যোগাযোগ করতে চান?'

'টেলিফোনে ওকে বলে দিই। কিন্তু ও চলে গিয়ে সমস্যা হয়েছে।' বিশ্বজিত বলল, 'আমার স্ত্রীকে এবার ছেড়ে দিন। ওকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন?'

বিশ্বজিতকে আবার নির্বাক করে দেওয়া হল। ভদ্রমহিলাকে বাঁধন মুক্ত করে দিতে তিনি কোনওমতে উঠে বসলেন। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন বোঝাই যাচ্ছিল। সোনাভাই তার কাছে গেলেন, 'বিশ্বজিত ক্যাম্পের সঙ্গে আজ সকালেও কথা বলেছেন বলে জানি। উনি মিথ্যে বলছেন। আপনি যদি সত্যি না বলেন তা হলে আমি আপনাদের বাঁচাতে পারব না।'

'কী বলব?' বিড়বিড় করলেন মহিলা।

'কীভাবে কথা বলতেন?'

মহিলা বিশ্বজিতের দিকে তাকালেন। ক্ষমতাবান নেতাকে মাথা ঝুঁকিয়ে বন্দি অবস্থায় বসে থাকতে দেখে আরও ঘাবড়ে গেলেন। সোনাচাচা আর সময় নষ্ট করলেন না, 'উঠুন। উঠে বসুন।'

ভদ্রমহিলা কোনওমতে উঠে দাঁড়ালেন।

'কোন ঘরে অয়্যারলেস আছে?'

ভদ্রমহিলা বিশ্বজিতের দিকে তাকালেন। তার মাথা যেন আরও ঝুঁকে পড়েছে।

'কী হল?' প্রচণ্ড ধমক দিলেন সোনাভাই।

এবার ভদ্রমহিলা এগোলেন। সিঁড়ি দিয়ে দোতলার ঘরে ঢুকলেন। তাকে অনুসরণ করলেন সোনাভাই।

এ ঘরে কেউ নেই। ঘর ভর্তি শুধু ফার্নিচার। তার এক কোনায় গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মহিলা। একটা কাঠের বাক্স। বাক্সের দরজাটা খুলতেই সেটাকে দেখতে পেলেন সোনাভাই। বিদেশে তৈরি খুব শক্তিশালী অয়্যারলেস সেট।

সোনাভাইয়ের নির্দেশে বিশ্বজিতকে ওপরে তুলে আনা হল। সোনাভাই বললেন, 'এসব ক্ষেত্রে আপনি যে মিথ্যে বলবেন তা জানা ছিল। সেজন্যে আপনাকে আমি কিছু বলছি না। শুনুন বিশ্বজিত, আমি চাই আপনি এক্ষুনি আপনার ক্যাম্পকে নির্দেশ দিন সৌমিত্র ডাক্তারকে ছেড়ে দিতে। কোনওরকম চালাকির চেষ্টা করলে আপনাকে মেরে ফেলতে আমি একটুও দ্বিধা করব না।' বিশ্বজিতের হাত ও মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল।

'ডাক্তার আমার প্রধান ক্যাম্পে নেই।'

'যেখানে আছে সেখানেই আদেশ জানিয়ে দিন।'

'শুধু ছেড়ে দিলে যদি ফিরতে না পারে তা হলে আমি কিন্তু দায়ী নই।' বিশ্বজিত বলল।

'ওকে আগরতলায় পৌঁছে দিতে হবে।'

'এ অসম্ভব। আমি বড়জোর বর্ডারটা পার করে দিতে পারি।'

সোনাভাই আবার মুশকিলে পড়লেন। সীমান্ত পেরিয়ে ডাক্তার যখন আগরতলায় যাবে তখন যদি আবার তাকে ওরা ধরে নিয়ে যায়? ওরা না ধরুক, অন্য কোনও দলও তো একই কাজ করতে পারে! তিনি বললেন, 'ওকে আপনারা নিয়ে এসেছেন, ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আপনাদের নিতে হবে।'

বিশ্বজিত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কারা?'

'বললাম তো পুলিশ।'

'এত খবর কী করে পেলেন?'

'যা বলছি তাই করুন।'

'বেশ। করছি। আপনাদের সাহায্য আমাদের দরকার বলেই করছি। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।'

'শর্ত? আপনার?'

'হ্যাঁ। আমার বাবাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রামে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

সোনাচাচা মাথা নাড়লেন, 'বেশ। তাই হবে।'

'এটা কিন্তু ভদ্রলোকের চুক্তি।' বিশ্বজিত বলল।

'নিন, শুরু করুন।'

'বিশ্বজিত অয়্যারলেস সেটটা চালু করল। কয়েকটা বোতাম টেপার পর বলা শুরু করল, 'হ্যালো! হ্যালো! চেল স্পিকিং, চেল স্পিকিং। হ্যালো হ্যালো।'

এবার ওদিক থেকে গলা শোনা গেল, 'টাইগার সেভেন, ওভার? টাইগার সেভেন, ওভার।'

বিশ্বজিত বলল, 'চেল টু টাইগার সেভেন, ওভার।'

'ক্যারি অন। ওভার।' ওদিকের গলা।

'রিলিজ ডক্টর ইমিডিয়েটলি। রিলিজ ডক্টর। ওভার।'

'আর ইউ সিয়োর চেল? ওভার।'

'ইয়েস। আস্ক কে টু এসকর্ট হিম আপটু আখাউরা রোড নিয়ার আগরতলা। ওভার।' সেটটা বন্ধ করে দিল বিশ্বজিত।

সোনাভাই বললেন, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করছি না। ডাক্তার বর্ডার পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। আপনাদেরও আমরা বন্দি করে রাখতে বাধ্য হচ্ছি।'

'কিন্তু এরকম কথা ছিল না।' বিশ্বজিত প্রতিবাদ করল, 'আপনাকে তো আমি বলেছি টাকাটা দেব। সেটা নিয়ে চলে যান।'

'তাই?' সোনাভাই হাসলেন।

বিশ্বজিতের নির্দেশে মহিলা একটা স্যুটকেস বয়ে নিয়ে এলেন। বিশ্বজিত বলল, 'ওর মধ্যে দু লক্ষ ভারতীয় টাকা আছে। নিয়ে যান।'

'এরকম স্যুটকেস আর কটা আছে?'

'না নেই।'

সোনাভাই ইঙ্গিত করতে করিম ঢুকে গেল দ্বিতীয় ঘরটিতে। ফিরে এসে মাথা নাড়ল, নেই।

স্যুটকেস, বিশ্বজিত এবং মহিলাকে নিয়ে নীচে নেমে এল ওরা।

বিশ্বজিতকে বসিয়ে চেয়ারে বেঁধে এবার একজন অফিসারকে তুলে নিয়ে আসা হল। জাহিদ ওপর থেকে একটা টেপরেকর্ডার জোগাড় করে নিয়ে এসেছিল, সেটাকে চালু করা হল। কর্নেল এবং বিশ্বজিত পরস্পরকে দেখে অবাক। সোনাভাই বললেন, 'ওদের দায়িত্ব সীমান্ত পাহারা দেওয়া। দেশের মধ্যে কাউকে বেআইনিভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া নয়। বিশ্বজিত দেববর্মা, আপনি শ্রীমঙ্গলে বেআইনিভাবে আছেন। এখানে ক্যাম্প করে সশস্ত্র লোকদের রেখেছেন। ভারত থেকে নিরীহ মানুষকে কিডন্যাপ করে এখানে এনে মুক্তিপণ চাইছেন। আর এ ব্যাপারে যে দুজন আপনাকে সাহায্য করেছে তারা এই রাত্রে আপনার বাংলোতে এসেছে। এদের একজনের নাম, ওর নাম বলুন!'

অফিসার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না না। আমি কিছু জানি না।'

'তা হলে নাম বলতে আপত্তি কেন?' সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমরা এই বাংলোতে এসেছি ওর সম্পর্কে অভিযোগের তদন্ত করতে।'

'কী অভিযোগ?'

'এটা সরকারি ব্যাপার। আমি বলতে পারব না।'

বিশ্বজিত জ্বলন্ত চোখে তাকাল, 'মিথ্যে বলছে। ওরা এসেছিল টাকা নিতে।'

সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীসের টাকা?'

'এখানে থাকার জন্যে ওদের দুজনকে প্রতি মাসে টাকা দিতে হয়।'

'এর নাম কী?'

'হাসান আহমেদ।'

সঙ্গে সঙ্গে অফিসার আহমেদ চিৎকার করলেন, 'আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন মিস্টার দেববর্মা। এরপরে এখানে থাকা আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে যাবে।'

'আমার কাছে পুলিশ অনেক বেশি জরুরি।' বিশ্বজিত বলল।

'আপনারা পুলিশ?' অফিসার হাঁ হয়ে গেল।

'ওঁরা ঢাকা থেকে এসেছেন।' বিশ্বজিত বলল।

'প্লিজ অফিসার, আমাকে জড়াবেন না। এসবের মধ্যে আমি কখনও ছিলাম না। ওই ইকবালটা আমাকে লোভ দেখিয়ে জড়িয়ে ফেলেছে।' লোকটি ভেঙে পড়েছিল।

'ওঁর নাম ইকবাল?'

'হ্যাঁ। ইকবাল হক।'

ইকবাল হককে নিয়ে আসা হল। তখন আক্রান্ত হয়ে তিনি বোধহয় একটু বেশ আঘাত পেয়েছিলেন। এই ঘরে ঢোকামাত্র সব বুঝে গেলেন। চটজলদি কোমরে হাত রাখতেই করিম কথা বলল, 'আপনার রিভলভার এখন আমার হাতে।'

'আমাকে মেরে ফেলুন। কিল মি।'

'কেন?'

'আমি নিজের মুখে বলতে পারব না।'

'আপনার নাম ইকবাল হক? আপনি এবং হাসান আহমেদ জেনেশুনে টাকার লোভে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ঠিক কি না?' সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমরা তেমন বড় অন্যায় করিনি—!' আহমেদ বললেন।

'টাকা নিয়ে আমাদের দেশের মাটিতে বিদেশি সন্ত্রাসবাদীদের থাকতে দিয়েছেন। এটাকে আপনি বড় অপরাধ বলে মনে করেন না। চমৎকার!' সোনাভাই চিৎকার করে উঠলেন, 'কী মনে করেন আপনারা? যারা আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে খুন করেছিল তাদের সঙ্গে আপনাদের কোনও পার্থক্য আছে? আপনারা তো রাজাকারদের অধম। আপনাদের মতো লোকের ওপর সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে দেশবাসী নিশ্চিন্তে আছে আর তার কী হেনস্থা করছেন আপনারা।'

আহমেদ বলেন, 'আমি দুঃখিত।'

'দুঃখিত বললেই সাত খুন মাপ হয়ে যায় না।'

দুই অফিসারকে বন্দি করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। মহিলাকেও আবার বাঁধা হল। সোনাভাই বললেন, 'আমার লোক আগামী চব্বিশঘণ্টা আপনার এই বাংলো পাহারা দেবে। এই বাংলোর দুটো দরজাতেই আমরা বোমা লাগিয়ে দিচ্ছি। কেউ যদি কোনওভাবে নিজেকে মুক্ত করে দরজা খুলতে চান তা হলে নিজেই নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনবেন। বিশ্বজিত, চব্বিশ ঘণ্টা পরে বাংলাদেশ পুলিশ আপনাকে উদ্ধার করবে।' অয়্যারলেস সেটটাকে সঙ্গে নিয়ে নেওয়া হল। মোবাইল ফোনটাকেও।

বাইরে বেরিয়ে দরজাগুলো টেনে বন্ধ করা হল। বাংলোর ভেতর থেকে জাহিদ দুটো তালা এনেছিল। সেদুটো সামনের পেছনের দুই দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

অফিসারদের গাড়ির সামনে তখন দুজন যুবক পাহারায়। ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। সে ভয়ে কাঁপছে। টেপরেকর্ডার অন করে সোনাভাই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কার গাড়ি চালাও।'

'ক্যাপ্টেন হকের।'

'কী নাম তোমার?'

'ইমরান।'

'ক্যাপ্টেনসাহেবকে নিয়ে এই বাংলোতে এর আগে এসেছ?'

'হ্যাঁ। প্রত্যেক মাসে সাহেবরা একবার করে আসেন।'

'কেন আসেন?'

'জানি না।'

'এখানে এলে সাহেব কি তোমাকে কোনও বকশিশ দেন?'

'হ্যাঁ। পাঁচশো টাকা বকশিশ দেন।'

'ঠিক আছে, গাড়ি নিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।'

কাউকে পাহারায় না রেখে সোনাভাই সবাইকে নিয়ে সেই নির্জন বাংলোয় যখন ফিরে এলেন তখন রাত তিনটে। সব কথা শোনার পর বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি মনে হয় ওরা সৌমিত্রকে ছেড়ে দেবে?'

'আমার মনে হয়ে দেবে।'

'যদি না দেয়?'

'এখান থেকে আগরতলায় পৌঁছোতে দশ ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। বিশ্বজিত পালাতে পারবে না।'

'কিন্তু আপনি তো ওই বাংলোতে কোনও গার্ড রাখেননি—।'

'রাখিনি। কারণ পুলিশের নজরে আমার কোনও ছেলে পড়ুক আমি চাই না। এত রাত্রে ওদের উদ্ধার করতে নিশ্চয়ই কেউ আসবে না। কারণ কেউ সন্দেহ করেনি যে বিশ্বজিত বন্দি হয়ে আছে। তার আগেই সৌমিত্র ডাক্তারের সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়া উচিত।' সোনাভাই বললেন, 'কিন্তু বাসুদেব, এবার যে ঘটনা ঘটবে তাতে তোমারও এখানে থাকা উচিত নয়। ওই ক্যাপ্টেনের গাড়িতে তুমি ওঠো। করিমও সঙ্গে থাক। জাহিদ তুমিও ওদের সঙ্গে থাকো। ওই গাড়িতে তুমি স্বচ্ছন্দে বর্ডার চলে যেতে পারবে। তোমার উচিত আজই এ দেশ থেকে চলে যাওয়া।'

'কিন্তু—!'

'না। কোনও কিন্তু নয়। এর পরেও যদি ডাক্তার মুক্তি না পায় তা হলে কিছু করার নেই।'

বাসুদেব সোনাভাইয়ের হাত ধরল, 'আপনি যা করলেন তার জন্যে—!'

'চুপ করো। একাত্তর সালে তোমার বাবা যা করেছেন এ তার তুলনায় কিছু নয়। যাও। আর এবার বৈধ ভিসা নিয়ে ঢাকায় এসো।' সোনাভাই হাসলেন।

বাসুদেবকে নিয়ে করিম ও জাহিদ ক্যাপ্টেনের গাড়িতে রওনা হয়ে যাওয়ার পর সোনাভাই মোবাইলের বোতাম টিপলেন। রিং হচ্ছে। এবার গলা পেয়ে তিনি বলেন, 'বাদলভাই, হোম মিনিস্টারকে এখনই ফোনে ধরুন। বলুন শ্রীমঙ্গল থানার অফিসারকে আমার কথা বলতে। বিরাট ঝামেলা হয়েছে।'

'ঝামেলা? মানে, কাজটা হয়নি?' বাদলভাই উদ্‌বিগ্ন।

'হয়েছে। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিক্রি করতে চায় এমন দুজন অফিসারকে ধরতে হয়েছে। আপনি ফোন করুন।'

'মিনিস্টারকে এত রাতে ফোন করা ঠিক হবে? আমি হোম সেক্রেটারি আর পুলিশের প্রধানকে ফোন করছি। ওই দুজনকেই আমি ভাল চিনি।' বাদলচাচা বললেন।

'ঠিক আছে, যা করার তাড়াতাড়ি করুন।' ফোন বন্ধ করলেন সোনাভাই।

ভোরের একটু আগে একটা গাড়ি শ্রীমঙ্গল থানায় ঢুকল। থানায় তখন আলো

জ্বলছে। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে খোদ দারোগা এসে দাঁড়ালেন গেটে। গাড়ি থেকে নামলেন সোনাভাই। এগিয়ে গিয়ে প্রাথমিক সম্ভাষণের পর বললেন, 'আমার নাম আকবর হাফিজ সোনা।'

'আসেন আসেন। আপনার আসার কথা শুনেই অপেক্ষা করছি, কী ব্যাপার?'

'আপনার ঘরে চলুন।'

দারোগার ঘরে গিয়ে বসার পর সোনাভাই ওঁকে টেপ বাজিয়ে শোনালেন। শোনার পর ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠল, 'আই বাপ! সর্বনাশ। হালারা কুথায়?'

'আমার গাড়িতে আছেন দুজন।'

'দুজনেই?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এই টেপটাই ওদের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ। এটা আমি সোজা হোম মিনিস্টারের হাতে দিতে চাই।' সোনাভাই বললেন।

'আমাকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।'

'জানি। তবু, সাবধানের মার নেই।'

'কিন্তু আপনি ঢাকায় বসে যে কথা জানলেন আমি এই শ্রীমঙ্গলে থেকেও টের পাইনি? আপনি কি আমার ডিপার্টমেন্টের মানুষ?'

'না। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের উপকার হয় এমন কাজ করতে পারলে আমি শান্তি পাই। আপনি এদের অ্যারেস্ট করুন।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু ঢাকায় আপনাকে কে খবরটা দিল?'

'একজন সাংবাদিক।'

'কিন্তু এখানে এসে আমাকে আগে জানালেন না কেন?'

'সময় পাইনি।'

'দেখুন তো কত বড় বিপদ হতে পারত আপনার?'

'তা ঠিক।'

'দারোগা নিজে গেলেন অফিসারদের নিয়ে আসতে। তাদের চেয়ারে বসিয়ে যাবতীয় অভিযোগগুলো লিপিবদ্ধ করতে করতে ভোর হয়ে গেল। টেপ রেকর্ডারে স্বীকারোক্তির কথাও লেখা হল। এবার দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাংলোটা কোথায়?'

সোনাভাই বুঝিয়ে দিলেন, 'কিন্তু একটা অনুরোধ।'

'বলুন।'

'আরও তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। তার আগে ওখানে যাবেন না।'

দারোগা অবাক, 'কেন? যদি পাখি উড়ে যায়?'

'যাবে না। সেই গ্যারান্টি আপনাকে দিচ্ছি!'

'আমি আপনার কোনও কথা বুঝতে পারছি না। যাক গে, ঢাকা থেকে ফোন এসেছে যখন তখন আপনার কথা শুনছি। এবার বি ডি আরকে জানাতে হবে। ওরা নিজেদের আইনে বিচার করতে চাইলে আসামিদের ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। মুশকিল হল, ওরা প্রমাণ চাইবে। তখন কী করব?' দারোগা সত্যি সমস্যায়

পড়লেন।

ঘণ্টাখানেক সময় চেয়ে সোনাভাই কুদ্দুসসাহেবের বাংলোতে চলে এলেন। সেসময় তিনি সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। সোনাভাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কাছে দুটো টেপরেকর্ডার আর একটা খালি ক্যাসেট আছে?'

'দুটো তো নেই। একটা টেপডেক আর ক্যাসেট আছে।' কুদ্দুসসাহেব বললেন।

'মুশকিল হয়ে গেল। টেপের জন্যে তো আর বিশ্বজিতের বাংলোয় যাওয়া যায় না।'

কুদ্দুসসাহেবের চেষ্টায় আর একটা টেপরেকর্ডার যোগাড় হল। ক্যাসেটটা ট্রান্সফার করতে দিয়ে সোনাভাই চা খেতে খেতে কুদ্দুসসাহেবকে সব কথা খুলে বললেন। শুনে কুদ্দুসসাহেবের চোখ কপালে উঠল, 'সর্বনাশ। এরা তো দেশদ্রোহী।'

'আমি ঢাকায় ফিরে প্রথমে সাংবাদিক সম্মেলন করতে চাই মুক্তিযোদ্ধা কমিটির পক্ষে। সব কাগজে খবরটা বের হোক যাতে ভবিষ্যতে বিদেশি উগ্রপন্থীরা এ দেশে জায়গা না পায়। আপনি একটা উপকার করুন। এই ক্যাসেটটা থানার দারোগার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমি ঢাকায় রওনা হচ্ছি।' সোনাভাই বললেন।

কুদ্দুসসাহেব বললেন, 'আপনি মনে হয় কোনও কিছুর ভয় পাচ্ছেন?'

'আমি ক্যাসেটটা বাঁচিয়ে রাখতে চাই।'

'তা হলে প্লেনে চলে যান।'

'না। এই ছেলেদের রেখে আমি যেতে পারব না।'

'তা হলে এক কাজ করুন। আপনার, না আপনার নয়, বাদলভাইয়ের ঠিকানায় ক্যুরিয়ার করে দিন ক্যাসেটটা। আপনি পৌঁছোবার আগেই ওটা নিরাপদে পৌঁছে যাবে।'

কুদ্দুসভাইয়ের পরামর্শ ভাল লাগল সোনাভাইয়ের। ট্রান্সফার হয়ে গেলে একটু বাজিয়ে শোনা হল। দেখা গেল গলার স্বর ঠিক আছে। ক্যাসেট থানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে কুদ্দুসসাহেব সোনাভাইকে নিয়ে শহরে গেলেন। তখনও অফিস খোলেনি, খোলার সময় হয়নি। কিন্তু কুদ্দুসসাহেব ক্যুরিয়ার সার্ভিসের মালিককে খুঁজে বের করলেন। কুদ্দুসসাহেবের চা বাগান এঁদের বড় গ্রাহক। সেই তিনিই নিজে এসেছেন দেখে মালিক বেশ বিগলিত। তিনি বললেন, 'যেমন করেই হোক আজ সকালের ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি স্যার। পেমেন্টের ব্যাপারে ভাববেন না। আপনি এসেছেন এটাই আমি ভাবতে পারছি না।'

ওঁদের সামনে মোটা খামে ক্যাসেট ভরে সিল করে নিয়ে মালিক ছুটল। সোনাভাই আবার ঢাকায় ফোন করলেন। বাদলভাই তাঁর গলা পেয়ে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাসুদেব কোথায়?'

'সে বোধহয় এতক্ষণে সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছে। ওর জন্যে চিন্তা করবেন না। বি ডি আরের গাড়িতে গিয়েছে। মন দিয়ে শুনুন। আজই আপনি একটা প্যাকেট ক্যুরিয়ার সার্ভিসে পাবেন। ওটা পাওয়ামাত্র আগামীকাল মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ

থেকে একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকবেন। আর হ্যাঁ, প্যাকেটটা খুলবেন না।'
'কী আছে প্যাকেটে?'
'রাজাকারদের স্বীকারোক্তি।' সোনাভাই বললেন।

দাবাটা খুব জমে উঠেছিল। পার্বত্য ত্রিপুরার যে লোকটির সঙ্গে সৌমিত্র দাবা খেলছে গত কয়েকদিন ধরে তার খেলার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম দিকে খেলতে বসেই সে বিপক্ষের বল খেয়ে নিত নিজের বলের বিনিময়ে। ক্রমশ একটু একটু করে সে সৌমিত্রকে অনুকরণ করে চাল ভাবতে শিখল। সৌমিত্র রাজাকে দুর্গজাত করায় লোকটা আক্রমণ করতে পারছে না। গালে হাত দিয়ে সে শুধু ভেবেই চলেছে। এমন সময়ে ছেলেটি এল। এই বিপ্লবী ছেলেটির নাম সৌমিত্র এখন পর্যন্ত জানতে পারেনি।

ছেলেটি এসে বলল, 'ভোর হতে না-হতেই দাবা খেলছেন? এখনও তো-মোরগ ডাকছে জঙ্গলে।'

'কী করব! ও ইশারা করল, আমারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সূর্য না উঠলেও দাবা খেলার মতো যথেষ্ট আলো ফুটেছে। এখানে তো সময়ের হিসেব করে কোনও লাভ নেই।' সৌমিত্র বলল।

'উঠে পড়ুন। চটপট। শার্ট প্যান্ট পরে নিন।'

'কেন? আবার হাঁটতে হবে?' সৌমিত্র শঙ্কিত।

'হ্যাঁ। দেখুন, জুতোটা পায়ে ঢোকালে ব্যথা বাড়ে কি না, নইলে ওটা হাতেই নিন।'

মিনিট দুয়েকের মধ্যে ওরা হাঁটা শুরু করল। সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আপনি আগরতলায় ফিরে যাচ্ছেন।' ছেলেটি বলল।

'কী?' চমকে উঠল সৌমিত্র।

'দাঁড়াবেন না। বর্ডার পার হতে হবে আটটার মধ্যে। নইলে আজ আর ওপারে যেতে পারবেন না।'

'তার মানে তোমরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' ছেলেটি আবার হাঁটতে লাগল।

জুতোজোড়া পায়ে ঢোকাতে বেশ ব্যথা লাগছিল। ক্ষত একটু শুকিয়েছে, ব্যথা খুব। বরং খালি পায়ে হাঁটতে বেশি আরাম লাগছে। জুতোজোড়া হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছিল সৌমিত্র। এখন তার মন বিষাদে ভরে গেল। তা হলে পঁচিশ লক্ষ টাকা এদের দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। বাবার চাকরিসূত্রে পাওয়া টাকা আর গয়না বিক্রি করে বড়জোর পনেরো লক্ষের ব্যবস্থা হতে পারে, বাকিটা কি তা হলে ধার করা হল? খুব খারাপ লাগছিল। এই ধার তাকেই শোধ করতে হবে। আগরতলায় এখন বেশ কয়েকজন ডাক্তার আছেন যাঁদের দৈনিক রোজগার পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু তাঁরা সার্জেন। অপারেশন করে থাকেন। একজন সাধারণ এম বি বি এস-

এর পক্ষে এখনই দিনে দুশো টাকা রোজগার করা প্রায় অসম্ভব। সে-কারণেই তাকে চাকরি নিতে হয়েছিল।

আপশোস হচ্ছিল আর একটা কারণে। ট্রান্সফার অর্ডার আসার পর সবাই তাকে নিষেধ করেছিল মান্দার অঞ্চলে যেতে। সেই নিষেধটা শুনলে আজ তার পরিবার এমন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ত না। হঠাৎ তার মনে পড়ল এরা বাসুদেবের খোঁজ করছিল। বাসুদেব নাকি উধাও। সেইসঙ্গে দশরথ দেববর্মা নামের একটা লোক। বাসুদেবকে কি অন্য কোনও উগ্রপন্থী দল অপহরণ করেছে? কিন্তু এখন পর্যন্ত ত্রিপুরার মূল বাসিন্দাদের তো অপহরণ করা হয়নি। তা হলে একই সঙ্গে দশরথকেও পাওয়া যাচ্ছে না কেন? জেস্টারের কথায় মনে হয়েছিল, দশরথের জন্যে সে খুব উদ্‌বিগ্ন।

হঠাৎ সৌমিত্র প্রশ্ন করল, 'দশরথ দেববর্মা কে?'

'আমি চিনি না।' ছেলেটি হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিল।

আশ্চর্য ছেলে। কিছুতেই খোলস ভেঙে সহজ হবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেসব বিপ্লবী ইংরেজদের হত্যা করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তাদের ভাবভঙ্গির সঙ্গে এই ছেলের বেশ মিল আছে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছে ক্যাম্প থেকে। এখন রোদ উঠেছে। আগরতলায় যেতে হলে আটটার মধ্যে সীমানা পেরোতে হবে। এই ছেলেটি কত দূরে তার সঙ্গে যাবে বোঝা যাচ্ছে না। ও যদি এখানেই দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে, এবার থেকে নিজেই পথ চিনে হাঁটুন তা হলে সে কিছুতেই পৌঁছোতে পারবে না। কারণ এতটা পথ তারা এসেছে কিন্তু কোনও বাড়ি দেখতে পায়নি।

'এবার পায়ে ব্যথা হচ্ছে।' সৌমিত্র জানাল।

'আপনি কি একটা দিন এখানে থাকতে চান?' ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল।

'না।'

'তা হলে হাঁটুন।'

'এভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে কেন? কাছাকাছি কোথাও গাড়ি চলাচলের রাস্তা নেই?'

'আছে। কিন্তু সেখানে আপনাকে দেখতে পেলে ওরা বাংলাদেশের জেলে ভরে দেবে।'

'ও। আমরা কোনও গাড়ি ভাড়া করতে পারি না?'

'না। আর পাঁচ মিনিট, এখন আর কথা বলবেন না।' ছেলেটি সতর্ক করল।

মিনিট পনেরো বাদে ছেলেটি দাঁড়াল। একটা বড় গাছের আড়াল থেকে চারপাশে দেখল। ওকে দেখাদেখি নিজেকে লুকিয়ে রাখল সৌমিত্র।

দুজন উর্দিপরা সৈনিক হাতে অস্ত্র নিয়ে কিছুটা দূর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেল। ওরা চারপাশে তাকাল, নিশ্চিত হয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। ছেলেটি ইশারা করল এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। খুব দ্রুত ছেলেটি হাঁটছিল। ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না সৌমিত্র। কিন্তু সে বুঝতে পারল সীমানা পেরিয়ে

এসেছে। এপাশে সৈনিকদের দেখতে পেল না সে। এবার সহজ ভঙ্গিতে আবার জঙ্গলে ঢুকে গেল ছেলেটি। সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'এদিকে পাহারা নেই?'

'আছে। এক ঘণ্টা পর পর ওরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে টহল দিয়ে আবার ফিরে যায়। এই অঞ্চল দিয়ে আজকাল সাধারণ মানুষ যে পারাপার করে না তা ওরা জানে।' ছেলেটি বলল।

'কেন করে না?'

'প্রথম কথা, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অনেকটা হেঁটে আসতে হয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের এড়িয়ে যেতে চায়।'

'তোমরা কোথায়? এতটা পথ এলাম, আর কাউকে তো দেখতে পেলাম না।'

'আছে। তারা কেন আপনাকে দেখা দেবে। এই যে আমি আপনাকে নিয়ে সীমানা পেরিয়ে এলাম এই খবর মেইন ক্যাম্পে একটু পরেই পৌঁছে যাবে।'

'মেইন ক্যাম্প কোথায়?'

'জানি না!' ছেলেটি মুখ বন্ধ করল।

'তোমাদের সর্বাধিনায়কের নাম কী?' সৌমিত্র নাছোড়বান্দা।

'আমি যে কোনও জবাব দেব না তা আপনি জানেন।'

'বুঝলাম। আচ্ছা ভাই, তুমি সত্যি বিশ্বাস কর ত্রিপুরা কখনও স্বাধীন হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু ত্রিপুরা তো পরাধীন নয়। সে ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ, স্বাধীন।'

'এসব বুর্জোয়াদের কথা। সাজানো কথা। ঊনপঞ্চাশ সালের পনরোই অক্টোবরের আগে ত্রিপুরা কি ভারতের অঙ্গ ছিল? ভারত আলাদা ছিল ত্রিপুরা আলাদা। তা হলে? ওই আসামের মধ্যে দিয়ে না আসলে আপনারা ভারত থেকে এখানে পৌঁছোতে পারবেন? ভারতের অন্য কোনও রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান কি এরকম? আসলে, আপনারা, বিদেশিরা ত্রিপুরার বুকের ওপর জাঁকিয়ে বসেছেন, দু হাতে টাকা কামাচ্ছেন অতএব ত্রিপুরাকে ভারতের অঙ্গ না বললে তো আপনাদের অসুবিধে হবে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি ভারত সরকারের চাপে ত্রিপুরাকে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমরা পরাধীন, ভারতের কাছে।' ছেলেটি কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। বলার সময় তাকে খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছিল।

'কিন্তু তোমার স্বপ্ন যদি সত্যি না হয়?'

'স্বপ্ন সত্যি হবেই। আমি যদি দেখে না যেতে পারি, আমাদের পরে যারা আসবে তারা স্বপ্নটাকে সত্যি করবে।' ছেলেটি জোরের সঙ্গে বলল।

'তোমাকে একটা কথা বলছি।'

'বলুন।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। কিন্তু তোমার মধ্যে যে জোর আছে তাকে আমি শ্রদ্ধা করছি। এবং সেইসঙ্গে আপশোস হচ্ছে এই কারণে তুমি যদি মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত হতে তা হলে দেশ হয়তো আকাঙ্ক্ষিত নেতাকে পেত।' সৌমিত্র বলল।

ছেলেটি শব্দ করে হাসল, 'আপনাকে আমি বেশ বুদ্ধিমান বলে ভাবছিলাম।'

'ভাবনা পালটাতে হচ্ছে কেন?'

'কী ধরনের নেতা হতে পারি যদি ভারতবর্ষের মূলস্রোতে থাকি? চোর বদমাস ডাকাত কালোবাজারির নেতা? ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে যারা দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেয়? বোফর্স বা তহেলকা ডটকমের কথা ছেড়ে দিন, আপনাদের দেশে এই মুহূর্তে কোনও নেতা আছেন যাঁকে সারা দেশের মানুষ এক বাক্যে শ্রদ্ধা করে? না নেই। প্রায় প্রতিটি নেতা তার দুর্গন্ধ চেপে ফরসা পাঞ্জাবি পরে গলা ফুলিয়ে বক্তৃতা দেন! নিজে চুরি না করুন, ছেলেমেয়ে জামাইকে চুরি করার সুযোগ দেন না তাঁরা? নির্বাচনে জেতেন কী করে? টাকা আর গুলি দিয়ে ভোট পেতে হয় কেন তাঁদের? কারণ মন্ত্রিত্ব পেলে তার বহুগুণ নিজের পকেটে ঢোকাতে পারেন। আমি আত্মহত্যা করব কিন্তু এইরকম একজন নেতা হতে পারব না।' ছেলেটি বেশ [illegible]ত গলায় বলে গেল।

সৌমিত্র কোনও কথা বলল না। এই ছেলের মাথা থেকে হাজার চেষ্টা করলেও এইসব ভাবনা দূর করা যাবে না। হঠাৎ ছেলেটি দাঁড়াল, 'আপনি বাসে যেতে চাইছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে এগিয়ে যান। বাঁ দিকে পাঁচ মিনিট গেলে রাস্তা পেয়ে যাবেন।'

'তুমি যাবে না?'

'না। আমি ওদিকে যাব না।'

'কেন?'

'ওদিকের গ্রামটায় বাঙালিরা থাকে।'

'তো?'

'আমরা কেউ কারও এলাকায় যাই না।'

'কিন্তু আমি একা যাব না। প্রথম কথা, আমার পকেটে একটা টাকাও নেই। দ্বিতীয় কথা, যদি আমি আবার কোনও দলের হাতে পড়ি তা হলে—।' থেমে গেল সৌমিত্র।

'আপনি এমনভাবে বলছেন যেন এরকম ঘটনা শুধু ত্রিপুরাতেই ঘটছে।'

'আমি সে কথা কখন বললাম? এ কথা সবাই জানে কোনও কোনও চক্র আছে যারা তোমাদের নকল কোরে এই কাজ করে।' সৌমিত্র বলল।

'হ্যাঁ। জানতে পারলে আমরা তাদের শাস্তি দিই। কিন্তু আমরা কাজটা করি টাকার জন্যে। কারণ স্বাধীনতাযুদ্ধে টাকার দরকার হবে। কিন্তু বাকি যারা শুধু ব্যক্তিগত রোজগারের জন্যে মুক্তিপণ দাবি করে তাদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে আমাদের ফেলবেন না।' ছেলেটি বলল, 'তা হলে চলুন হাঁটা যাক।'

দুপুর নাগাদ তারা সেই বাড়িতে পৌঁছোল যেখানে মহিলা খাবার এনে তাদের দিয়েছিলেন। সেই বাড়ি একইভাবে রয়েছে শুধু কোথাও কোনও পাহারাদার নেই। সৌমিত্রকে বাইরের বারান্দায় বসিয়ে রেখে ছেলেটি ভেতরে ঢুকে গেল।

সৌমিত্র দেখল পায়ের শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতগুলো আবার চাঙ্গা হয়েছে। এভাবে

না হেঁটে যদি সে কাছাকাছি কোনও পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে সব কথা খুলে বলে তা হলে নিশ্চয়ই একটা গাড়ির ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু তাতেও তো একটা সমস্যা হবে। বাড়ি থেকে পুলিশকে জানানো হয়েছে কি না সে জানে না। ফলে উলটো বিপত্তি না হয়। আগরতলায় পৌঁছোলে এ নিয়ে হইচই হবেই। ডি আই জি সাহেব নিজের ছেলেকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনলেন, লোকে সব জেনেশুনেও ছি ছি করবে। এইসময় ছেলেটি বেরিয়ে এল, 'খাবার আসছে। আর আপনি জেনে খুশি হবেন একটি অটোরিক্সা কাছেই আছে। আপনি ওটায় চড়ে আগরতলায় যেতে পারবেন।'

অন্ধকারে গাড়িটা ছুটে যাচ্ছিল। হঠাৎ আলোর ইশারায় থামতে বলায় ড্রাইভার গাড়ি থামাল। উর্দিপরা ড্রাইভার কর্নেলের গাড়ি চালাচ্ছে দেখে পাহারাদার কথা খরচ করল না। গাড়ি এগোল। এরপর করিম ড্রাইভারকে বলেছিল, 'তুমি বুঝতেই পারছ আমরা গুন্ডা বদমাস নই।'

'না স্যার।' ড্রাইভার মাথা নেড়েছিল।

'কী করে বুঝলে তুমি?'

'তা হলে দারোগাসাহেব আপনাদের অত খাতির করত না। আমাদের দুই সাহেবকে অ্যারেস্ট করত না।' বলেই একটু চুপ করে গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সাহেবরা নিশ্চয়ই খুব বড় অন্যায় করেছে, না স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের ওখানে অনেকেই সাহেবদের ওপর রেগে আছে। আর চাকরি থাকবে না, না?'

'না। ফাঁসি হয়ে যাওয়া উচিত।' জাহিদ বলেছিল।

শেষপর্যন্ত রাস্তা যেখানে শেষ হল সেখানেই বি ডি আরের অফিস। দ্রুত দুজন অস্ত্রধারী এগিয়ে এল। কর্নেলের গাড়ি দেখে স্যালুট করল।

করিম বলল, 'এই ভদ্রলোক একজন রিপোর্টার। ওঁকে ওপারে যেতে দিন।'

'কিন্তু—!'

'না দিলে বিপদ হবে। আমরা মুক্তিযোদ্ধা।' জাহিদ গম্ভীর গলায় বলল।

একজন সৈনিক বলল, স্যার আমরা যেতে দিলেও বি এস এফ ছাড়বে না।'

'সেটা ওঁর সমস্যা। আপনি যান।' বেশ কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলল জাহিদ।

ওদের ধন্যবাদ দেওয়ার সুযোগ পেল না বাসুদেব। গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কোনদিকে যাব? রাস্তা তো—।'

ড্রাইভার বলল, 'বাঁ দিকের সরু রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে যান স্যার।'

বাসুদেব চোখের আড়াল হতেই গাড়ি ঘোরাতে বলল করিম। ড্রাইভার তৎপরতার সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা হতেই জাহিদ ইশারা করল করিমকে। নিচু গলায় বলল, 'এখানে নেমে গেলে প্রচুর হাঁটতে হবে। ঠিক সময়ে নেমে যাব।'

তখন ভোর। আকাশে রং লেগেছে, পাখি ডাকছে। বাসুদেব এগোচ্ছিল। হঠাৎ চিৎকার ভেসে এল, 'হল্ট।'

সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর হাত তুলল।

চিৎকারটা এবার কাছে এগিয়ে এল, 'হু কামস দেয়ার?'

বাসুদেব জবাব দিল চেঁচিয়ে, 'ফ্রেন্ড।'

চারজন ভারতীয় বি এস এফ সৈনিক এগিয়ে এল। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

'রিপোর্টার।'

'ইন্ডিয়ান না বাংলাদেশি?'

'ইন্ডিয়ান।'

'পাসপোর্ট?'

'কম্যান্ডান্ট কোথায়? তাঁর কাছে নিয়ে চলো।' বাসুদেব এদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল না। ওরা ওকে নিয়ে ক্যাম্পে এল। একটা চেয়ার দিল বসতে। বলল ওকে অপেক্ষা করতে হবে। আধঘণ্টা পরে যখন পৃথিবী পরিষ্কার তখন কম্যান্ডান্ট এলেন। দূর থেকেই তিনি চিৎকার করলেন, 'আরে তুম? বাসু, হোয়াট এ সারপ্রাইজ।'

বাসুদেব উঠে দাঁড়াল। বিনোদ কাপুর। স্কুলে ওরা একসঙ্গে পড়ত। ট্রেইনারকে মারার অপরাধে যখন তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল তখন বিনোদ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। সে উচ্ছ্বসিত হল, 'আরে ইয়ার! তুমি এখানে?'

বিনোদ কাপুর বিশ্বাসই করতে পারছিল না নিজের চোখকে। বাসুদেব হেসে বলল, 'পৃথিবীটা সত্যি ছোট।'

'তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি কোত্থেকে আসছ?'

'আপাতত বাংলাদেশ থেকে।'

'কী ব্যাপার?' গম্ভীর হয়ে গেল কাপুর।

'তুমি কি জান আমি এখন কোন প্রফেশনে আছি?' বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

'একটুআধটু শুনেছি। তুমি টিভি রেডিয়োর মিডিয়ায় কাজ করছ। লাল কিছুদিন আগে বলছিল।'

'লাল এখন কোথায়?'

'এতদিন এখানেই ছিল, এখন নর্থ বেঙ্গলে পোস্টেড।'

'আমি একটা অপারেশনে গিয়েছিলাম।'

'তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। ইউ বেটার কাম উইদ মি।'

'বিনোদ কাপুরের সঙ্গে গেল বাসুদেব। এখানে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের জন্যে অস্থায়ী ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে। তার একটাতে বিনোদ থাকে। বিনোদ বলল, 'তুমি খুনটুন করে আসনি তো?'

'না। তোমার ভয় নেই।'

'তোমাকে বাংলাদেশ অপরাধী হিসেবে খুঁজছে না তো?'

'বরং উলটো। আমার জন্যে বাংলাদেশ সরকার জানতে পারবেন তাঁদের মধ্যে কোন কোন অপরাধী ভাল মানুষের মুখোশ পরে আছে।' বাসুদেব বলল।

'তার মানে তোমার মাথা বয়স বাড়ার সঙ্গে একটু ঠান্ডা হয়েছে।' হাসল

কাপুর।

'বুঝলাম না।'

'মনে নেই? ইনস্ট্রাক্টারকে তুমি কীরকম মেরেছিলে?' বলেই হেসে উঠল কাপুর।

মাথা নাড়ল বাসুদেব। সেই ঘটনা না ঘটলে আজ হয়তো সে বিনোদের মতো একজন বড় অফিসার হয়ে থাকত। তাতে অবশ্য আপশোস নেই। সে এখন যা করছে তাতেও তো বেশ মজা পাচ্ছে।

বিনোদ তাকে স্নান করে নিতে বলল। সেসব করার পর বাসুদেব হালকা হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি আগরতলায় একটা ফোন করতে চাই।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যাপারটা আমি জানতে চাই বাসুদেব।'

অতএব বলতে হল। যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বলতে বলতে দেখল বিনোদ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ওর চোখ মুখ তাই বলছে। শেষ করার পর জিজ্ঞাসা করল, 'ওই দুই অফিসারের নাম বলতে পার?'

'একবার শুনেছিলাম, এখন মনে নেই। ওরা এখন থানায় আছে।'

'গুড। কিন্তু তোমার রিলেটিভকে কি ওরা ছেড়ে দিয়েছে?'

'দেওয়ার কথা। তা হলে এতক্ষণে ও নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ায় পৌঁছে গেছে।'

'তুমি বাড়িতে ফোন করে জানতে চাও খবরটা?'

'হ্যাঁ।'

'আমার এখান থেকে সরাসরি কথা বলা যাবে না। তুমি নাম্বার দাও।'

বিনোদ অপারেটারের মাধ্যমে যোগাযোগ করল। মিনিট তিনেক চেষ্টার পর আগরতলার বাড়ির লাইন পাওয়া গেল। বিনোদ বলল, 'স্পিক হিয়ার।'

রিসিভার নিয়ে বাসুদেব বলল, 'বাসুদেব বলছি।'

'পি. বি-র উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'তুমি? তুমি কোথায়?'

'আমি নিরাপদে আছি। বিকেলের মধ্যে বাড়িতে পৌঁছোচ্ছি। সৌমিত্রর কোনও খবর পেয়েছেন আপনারা?' বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল।

'নো। নো।'

'পাবেন। আজই পাবেন। দয়া করে টাকা দেবেন না।' বলে লাইন কেটে দিল সে।

বিনোদ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এত নিশ্চিত হলে কী করে?'

বাসুদেব তাকাল, 'কোনও দলের চিফ যদি হুকুম করে তবে সেটা নীচের তলার লোক মানবে না?'

'ইউ ডোন্ট নো।' মাথা নাড়ল বিনোদ, 'এরজন্যে তোমাকে আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। যাক গে, তুমি আমাকে সমস্যায় ফেললে।'

'কীরকম?'

'আমি জানতাম চোরাগোপ্তা সীমান্ত পেরিয়ে কেউ কেউ যাওয়া আসা করে। দুপাশের গ্রামের লোকেরা এরকম করলে আমরা খুব কঠোর হই না। আমরা নজর রাখি স্মাগলারদের ওপরে। চোখ এড়িয়ে যে কেউ যাওয়া আসা করে না তা

অস্বীকার করব না। কোনও নদী বা পাহাড় দুই দেশের মধ্যে সীমানা হিসেবে থাকলে যে সুবিধে শুধু মাঠ জঙ্গলে সেটা পাওয়া যায় না। আমাদের দুই দেশের মাঝখানে তো আর লোহার ফেন্সিং তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু এদেশের সন্ত্রাসবাদীরা যদি সহজেই ও দেশে যাওয়া আসা করে তা হলে বুঝতে হবে ওরা আমাদের কারও সাহায্য পাচ্ছে। ওরা যাচ্ছে আর আমরা চোখ বুজে আছি এটা হতে পারে না। যারা চোখ বুজে থাকছে তাদের নিশ্চয়ই লাভ হচ্ছে। এই লোকগুলো দেশের শত্রু। তুমি কোন জায়গা দিয়ে ওপারে গিয়েছিলে?'

'জায়গাটা আমি মনে করতে পারছি না। কারণ আমি অনেকটা পথ জঙ্গল দিয়ে হেঁটে ওপারে গিয়েছি। ইনফ্যাক্ট, এই অঞ্চলের কিছুই আমি চিনি না।' বাসুদেব বলল।

'তুমি কীভাবে গেলে? কেউ নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করেছিল!'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করো না। এই অঞ্চলে যারা এমন ব্যবসা করে তাদের নাম যদি তোমরা না জান তা হলে সেটা কৃতিত্বের নয় বিনোদ।' বাসুদেব বলল।

'বুঝলাম। আমি ব্যাপারটা দেখছি। হ্যাঁ, তৃতীয় যে সমস্যা তার কী সমাধান করবে?'

'কোন সমস্যা?'

'যে লোকটাকে তুমি তোমার খামারবাড়িতে বন্দি করে রেখেছ তার কী করবে?'

'ওকে ছেড়ে দেব যদি সৌমিত্র ফিরে আসে।'

'যদি না ফিরে আসে তা হলে তুমি কতদিন ধরে রাখবে?'

'এখনও ভাবিনি।'

'ছেড়ে দিলেই সে তোমার প্রধান শত্রু হয়ে যাবে।'

'আমি জানি। কিন্তু কোনও উপায় ছিল না।'

'আমি এ ব্যাপারে তোমাকে পরামর্শ দিতে পারি।'

'যেমন?'

তোমরা পুলিশে ডায়েরি করো। এবং এই ব্যাপারে ওই লোকটাকে দায়ী কর। এতে পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করার সুবিধে পাবে। তোমার আত্মীয় এসে যদি বলে ওর ছেলের দল তাকে কিডন্যাপ করেছিল তা হলে মনে হয় কোর্ট ওর বেইল দেবে না। ও কি জানে কোথায় আছে?'

'না। সে সুযোগ ছিল না। জিপের নীচে উপুড় হয়ে শুয়েছিল দশরথ যখন ওকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার ড্রাইভার ওকে কোনও খবর দেবে না।'

'যদি দেখ তোমার রিলেটিভ ফেরেনি তা হলে ওকে কোর্টে তুলে কোনও লাভ হবে না, বেইল পেয়ে যাবে। কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না তোমরা। সে ক্ষেত্রে ওর চোখ বন্ধ করে বহু দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে এসো যাতে সে জায়গাটাকে আইডেন্টিফাই না করতে পারে।' বিনোদ বলল।

'বুঝতে পেরেছি।'

চা খাবার খাইয়ে বিনোদ তার দপ্তরের একটা জিপে বাসুদেবকে তুলে দিল যেটা আগরতলায় যাচ্ছিল। বাসুদেবের এখন খুব ঘুম পাচ্ছিল। এই জিপে থাকলে উগ্রপন্থীরা কিছু করবে না। বি এস এফের জিপ ওরা এড়িয়ে যায়। অতএব নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায়। রাস্তা যতই খারাপ হোক ঘুম আসতে দেরি হল না।

আগরতলা চারশো টাকা। ছেলেটি অটোচালককে বলেছিল, 'কোথাও না থেমে চলে যাবি।'

লোকটি মাথা নেড়েছিল, 'ইঞ্জিন গরম হয়ে যাবে। তেলও নিতে হবে যে।'

'যা করার করিস কিন্তু এর যেন কোনও ক্ষতি না হয়।'

'তা হলে রাত্রে গাড়ি চালাব না।'

'কেন?'

'কখন কোথা থেকে কোন শালা এসে মাল চাইবে কে জানে!'

'যা ভাল হয় তাই করবি।'

'টাকাটা—।'

সৌমিত্র শুনছিল। বলল, 'বাড়ি গিয়ে আমি টাকা দেব, চিন্তা করো না।'

'আমি তো শহরের ভেতর ঢুকব না।'

'কেন?'

'নিষেধ আছে।'

সৌমিত্র ছেলেটির দিকে তাকাল। ছেলেটি বলল, 'ফিরে এসে টাকা নিবি।'

'পেট্রলের দামটা—।' অটোচালক ইতস্তত করল।

ছেলেটা ওদের দাঁড়াতে বলে কোথাও গেল। ফিরে এল দশ মিনিটের মধ্যে। এতক্ষণ অটোতে চুপচাপ বসেছিল সৌমিত্র। একটা পুলিশের গাড়ি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছেলেটি পাঁচটা একশো টাকার নোট দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হবে?'

'হ্যাঁ। হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, যান।' ছেলেটি তাকাল সৌমিত্রের দিকে।

হঠাৎ সৌমিত্র আবিষ্কার করল ছেলেটির জন্যে তার মন খারাপ লাগছে। এই ছেলেটির সঙ্গে কদিন থেকে ওর সম্পর্কে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে হাত বাড়াল, 'ভাই, ভাল থেকো।'

ছেলেটি হাসল, 'কী করে ভাল থাকব বলুন।'

'হুঁ। তোমার নামটা এবার বলো।'

ছেলেটি এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'ত্রিপুরা।' বলে ইশারা করল অটোচালককে। অটো চলতে শুরু করল। স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল সৌমিত্র। তার মাথা কাজ করছিল না।

রাস্তা সর্বত্র ভাল নয়। প্রায়ই লাফাচ্ছে অটো। ঘণ্টা দুয়েক যাওয়ার পর অটো থামল। সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'গরম হয়ে গেছে। দশ মিনিটে ঠান্ডা হয়ে যাবে। আপনি চা খেতে পারেন।'

সৌমিত্র দেখল দুটো খাবারের দোকান রাস্তার পাশে। সে হাসল, 'আমার

ায়সা নেই।'

'যা খাওয়ার খেয়ে নিন, দাম আমি দিচ্ছি।' অটোওয়ালা বলল।

খিদে পেয়েছিল খুব। পেট ভরে পুরি তরকারি আর চা খেল সৌমিত্র। মটোওয়ালা দাম দিচ্ছে দেখে দোকানদার অবাক। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কাছে পয়সা নেই?'

'না।' সৌমিত্র জবাব দিল।

'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

অটোওয়ালা ধমক দিল, 'কেন? তোমার কী দরকার? বাঘের থাবা খাবে নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে দোকানদার হাত জোড় করল, 'না না। ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

অটো চালু হলে সৌমিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'বাঘের থাবা জিনিসটা কী?'

অটোওয়ালা হাসল, 'ওই যাদের একজন আপনাকে আমার গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল তাদের বাঘ বলে এরা। একবার থাবা খেলে আর বাঁচতে হবে না।'

বাঘ! অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্সকে এককথায় বাঘ বলে এরা। সৌমিত্র চোখ বন্ধ করল কিন্তু তার ঘুম আসছিল না। দু পাশে মাঠ, গাছগাছালি, অটো ছুটছিল।

সন্ধের মুখে অটোওয়ালা বলল, 'সামনে একটা জায়গা আছে। গ্যারেজে থাকতে পারবেন। রাত্রে আর যাব না।'

'এখান থেকে কত দূর আগরতলা?'

'মাইল কুড়ি।'

'যেতে অসুবিধে হবে?'

'হবে। গাড়িও গোলমাল করছে। দেখাতে হবে।'

'এখান থেকে বাসটাস পাওয়া যায় না?'

'রাত্রে এই লাইনে বাস যায় না। আপনাকে তো সকালেই বলেছি!'

সৌমিত্র নেমে দাঁড়াল। বেশ কিছু দোকান রাস্তার দু পাশে। একটা গ্যারাজের সামনে দাঁড়িয়েছিল অটোওয়ালা। পকেটে একটাও পয়সা নেই। আবার খিদে পাচ্ছে। বারংবার অটোওয়ালার কাছে চাওয়াও যাচ্ছে না। সে লক্ষ করল কেউ কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে। একজনের কৌতূহল যেন বেশি। লোকটা এগিয়ে এল, 'কোথায় যাবেন?'

'আগরতলা।'

'অটোয় এসেছেন?'

'হ্যাঁ। খারাপ হয়েছে।'

'এখন বাস পাবেন না। মালকড়ি থাকলে বলুন, ভাল থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল সৌমিত্র। একটা মাল বোঝাই ট্রাক আসছে। হাত তুলে থামাল সে ট্রাকটাকে। 'আগরতলায় যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

কথা না বলে উঠে পড়ল সে। ড্রাইভার ছাড়া আর একটি লোক ছিল। উঠে

বলল, 'আমি ডাক্তার।'
ড্রাইভার কী বুঝল সে-ই জানে। ট্রাক চলতে শুরু করল।

বাড়ির দরজায় অটো থেকে নামতেই নীলার চিৎকার শোনা গেল। দোতলার জানলা থেকে দেখতে পেয়েছে। মুহূর্তে বাড়ির চেহারা বদলে গেল। সবাই এসে তাকে জড়িয়ে ধরছে। এমনকী পি বি-ও।

অটোওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে ছেড়ে দেওয়ামাত্র ফোন বাজল। বাসুদেবের গলা, 'কোনও খবর আছে?'

সৌমিত্র ফোনটা ধরেছিল, 'হ্যাঁ। এইমাত্র ফিরেছি।'

'থ্যাঙ্ক গড।' লাইনটা কেটে দিল বাসুদেব।

রাস্তার ধারে একটা এস টি ডি বুথ থেকে ফোন করেছিল বাসুদেব, আগরতলায় ঢোকার মুখে। বি এস এফের জিপ ছেড়ে সে সোজা চলে এল বাড়িতে। গাড়ি বের করে ছুটল গাবারদির ফার্মে। তখন রাত নটা।

রাস্তা শুনশান। চৌকিদার গেট খুলতেই বাসুদেব জিজ্ঞাসা করল, 'সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ সাব।'

'বঙ্কিম কোথায়।'

'একটু আগে ওপরে গেল।'

'গাড়ি একেবারে কটেজের সামনে নিয়ে যেতেই বঙ্কিম বেরিয়ে এল, 'আপনি?'

'কী খবর?'

'আমি আর পারছি না। শুধু ছেড়ে দিতে বলে।'

'তুমি ঘরে গিয়ে ওর চোখ বাঁধো। হাত বাঁধা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'বেঁধে বাইরে নিয়ে আসবে। আর আমার সঙ্গে মুখে না-বলে ইশারায় কথা বলবে। জলদি করো।' বাসুদেব বলল।

বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ ছুটল। এই কাজ থেকে অব্যাহতি পাবে বুঝে সে-ও খুশি হয়েছে। দশরথকে বের করে নিয়ে এল সে। বাসুদেব ইশারায় গাড়িতে ওঠাতে বলল। দশরথ জিজ্ঞাসা করল, 'কই যাও? রিপোর্টার আসে নাই? আমারে মাইর‍্যা ফেলবা নাকি?'

বঙ্কিম বলল, 'চুপচাপ বসে থাকুন।'

তাই থাকল দশরথ। একটানা গাড়ি চালিয়ে গাবারদি থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটা বিশাল দিঘির কাছে চলে এল ওরা। ইশারায় দশরথকে নামাতে বলল বাসুদেব। চারদিকে ঘন অন্ধকার। দশরথ জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় আনলা আমারে?'

'বঙ্কিমকে দশরথের হাতদুটো খুলে দিতে ইশারা করল বাসুদেব। কিন্তু অন্ধকারে বঙ্কিম সেই ইশারা বুঝতে পারল না। তখন কাছে গিয়ে ওকে টেনে নিয়ে

এসে ফিসফিস করে বলল, 'খুলেই দৌড়ে গাড়িতে উঠে বসবে।'

বঙ্কিম তাই করল। ইঞ্জিন চালু রেখেছিল বাসুদেব। বঙ্কিম বসামাত্র গাড়ি ছোটাল! এখন দশরথ তার চোখের বাঁধন খুলে নিয়ে যে করেই হোক একটা সাহায্য পেয়ে যাবেই। গাবারদির কথা সে কখনও জানতে পারবে না।

বাসুদেব গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল, 'ওকে কি বলেছ কোথায় আটকে রাখা হয়েছে?'

'না স্যার। অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছিল, বলিনি।'

'গুড। ঠিকমতো খাওয়া হয়েছিল?'

'পেট ভরে খেত। আর কী নাক ডাকে!' বলেই বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু ডাক্তারদার কোনও খবর পাওয়া গেল?'

'তিনি বাড়িতে ফিরে গেছেন।'

'আঃ। বাঁচা গেল।' বঙ্কিম খুব খুশি।

গাড়ি ছুটছিল আগরতলার দিকে। হঠাৎ বঙ্কিম বলল, 'যাঃ খুব ভুল হয়ে গেছে।'

গাড়ি থামাল বাসুদেব, 'কী হয়েছে?'

'আপনি যদি একবার গাবারদিতে যান তা হলে ভাল হয় স্যার।'

'কেন?'

'অবলা জীবগুলো বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে আছে।'

'অবলা জীব?' বাসুদেব অবাক।

'হ্যাঁ স্যার। আমি রোজ নতুন নতুন ধরে ওকে দেখাতাম। আটটা টিকটিকি ধরেছিলাম আজ সকালে। ওভাবে পড়ে থাকলে কাল দুপুরের পর আর বাঁচবে না।' বঙ্কিম বলল।

হেসে ফেলল বাসুদেব, 'আজ আর পারছি না বঙ্কিম। ইচ্ছে হলে ওদের বাঁচাতে কাল সকালে তুমি গাবারদিতে যেয়ো।'

গাড়ি চালু করল বাসুদেব। আগরতলা আর বেশি দূরে নেই।

কিন্তু বাসুদেব বুঝতে পারছিল আগরতলায় পৌঁছে যাওয়া এখন যতটা সহজ ঠিক ততটাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে এদেশের সমস্যাটা। এর সমাধান কে বলে দেবে?